শান্তিকুমার মিত্র

আজকের জার্মানী

আজকের জার্মানী

শান্তিকুমার মিত্র

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া : ১৯৬৮
দাম : চার টাকা মাত্র

শিল্পী
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

GERMAN TO-DAY
Santi Kumar Mitra
Rs. 4·00

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

জার্মানীর সঙ্গে ভারতের মননগত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ফলে জার্মানী সম্পর্কে আমাদের স্বতঃ আগ্রহ। 'আজকের জার্মানী' সেই আগ্রহেরই নিদর্শন।

জার্মান জাতির যেমন বিপুল জীবন-প্রাচুর্য, তেমনি কর্মশক্তি। এই দুই আয়ুধ নিয়ে এ জাতি মাত্র ক'বছরেই,—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত দেশকে নতুন করে গড়ে তুলেছে। আজ পশ্চিম জার্মানী মহাসমৃদ্ধ দেশ। বর্তমান লেখক সাংবাদিক; সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি এই নতুন জার্মানীকে প্রত্যক্ষ করেছেন, জার্মানীর আত্মসংগঠনের এই মহতী অভিযানের তাৎপর্য, ব্যাপকতা অনুধাবন করেছেন। সেই অনুভবেরই স্বাক্ষর 'আজকের জার্মানী'।

এ গ্রন্থ অবশ্যই জার্মানীর প্রামাণিক দলিল নয়। কিন্তু নতুন জার্মানীর সঙ্গে লেখক গভীর আন্তরিকতাভরেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এ পরিচয়সাধন আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। ভারতেও আমরা আত্মসংগঠন যজ্ঞে ব্যাপৃত। সে বিচারে যে-কোন জাতির সংগঠনের ইতিহাস অনুধাবন করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য বলেই জ্ঞান করি। এ গ্রন্থ প্রকাশ করে বিনম্রচিত্তে সেই জাতীয় কৃত্যই সম্পাদন করতে চেয়েছি।

'আজকের জার্মানী' নিছক তথ্য পরিসংখ্যান কণ্টকিত নয়। অবিমিশ্র ভ্রমণ-আনন্দ উপভোগেরও অবকাশ রয়েছে। সেই

খণ্ড-খণ্ড ছবির মধ্য দিয়ে জার্মান জাতির বৈশিষ্ট্য, তার বিপুল জাতীয়তাবোধ, অনলস কর্মশক্তির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। নতুন ভারতের চোখে এ ছবি আকর্ষণীয় হবে বলেই বিশ্বাস। ইতি।

বিনীত

প্রকাশক

বিষয় সূচী

জার্মানীর কৃষক ও কৃষিশালা

উপরে (বাঁদিক থেকে) রাইফাইসেন—বিশ্বে সমবায় আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক। জারমান গোলা ও কৃষিশালা।
(নিচে) একটি জার্মান কৃষক পরিবারে তিন পুরুষ মিলে কাজ করছেন। নদী তীরে চাষের জমি। দ্রাক্ষাকুঞ্জ।
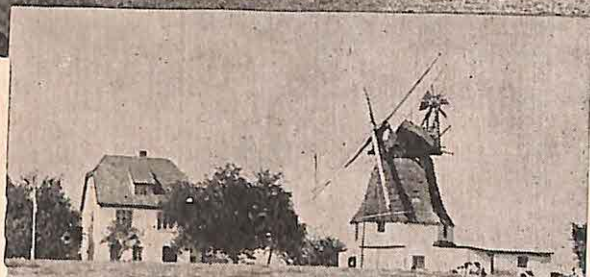
রাইন—নানা রূপে
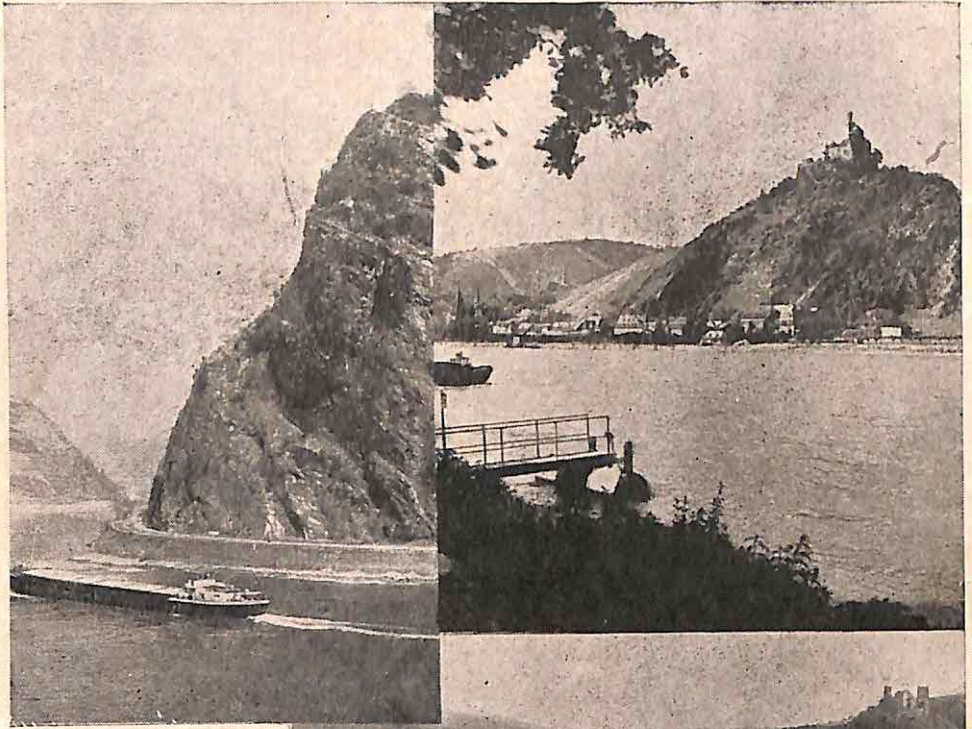
(বাঁদিক থেকে) পাহাড়ের গা ঘেঁসে রাইন প্রবাহিতা। রেল-পথ ও জলপথ পাশাপাশি। বন-এ রাইনের ঘরোয়া ছবি।
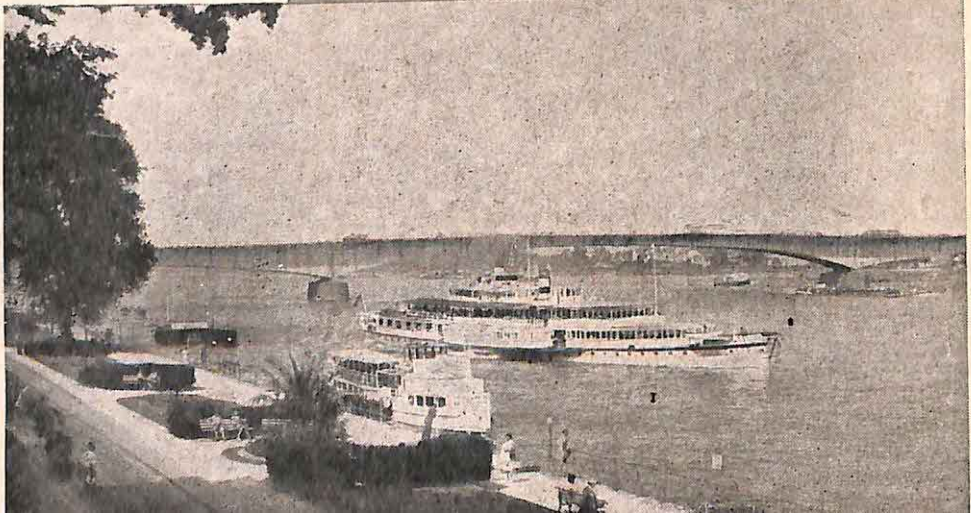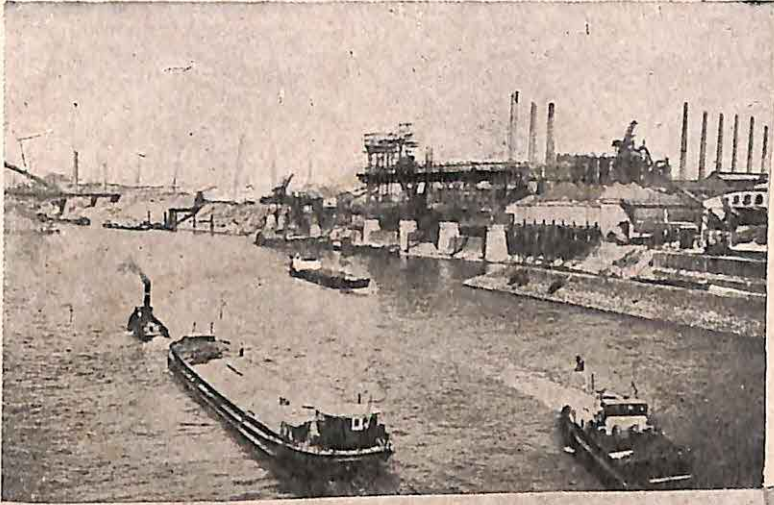
(বাঁ দিকে) রাইন নদী। জার্মানীর রুর অঞ্চলের কাছে।

(মাঝে বাঁ দিকে) বার্লিনের বিখ্যাত ব্রাণ্ডেনবার্গ তোরণ। বার্লিন নগরীর পতনের অব্যবহিত পরের দৃশ্য। বর্তমানে এ তোরণ পূর্ব বার্লিন অঞ্চলের অন্তর্গত।

(নিচে ডানে) এই ভাবে বার্লিন নগরী বিভক্ত হয়। ফুটপাত ও রাস্তা পড়েছে এক ভাগে, ছোট দেওয়াল ও তার পাশের জায়গা অন্য ভাগে। কালে দু ভাগের মধ্যে প্রাচীর উঠে, কাঁটাতারের বেড়া পড়ে।

জার্মানীর কয়টি দৃশ্য

(বাঁদিক থেকে) অটোবান-এ (সড়ক পথে) মোটরযান। পশ্চিম বার্লিনের একটি সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল। বিভিন্ন সড়ক পথের সংযোগস্থল। রুর অঞ্চল। ইস্পাৎ কারখানার প্রাথমিক অবস্থার মডেল।
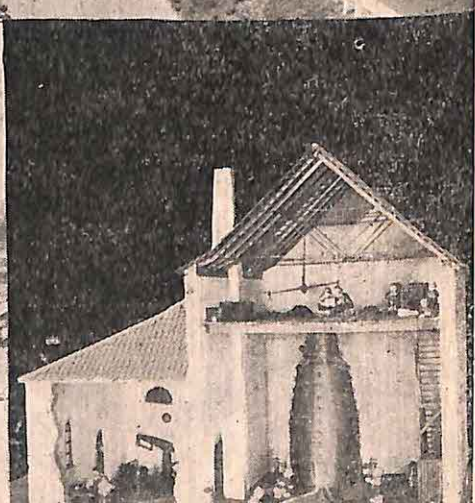
প্রারম্ভিকা

'আজকের জার্মানী' নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়। বা আজকের জার্মানীর প্রামাণিক মূল্যায়নও নয়। বরং বলতে পারি, ভ্রমণ-আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বপ্রতিষ্ঠ জার্মানীর জীবনীপ্রাচুর্যের উৎস সন্ধানের প্রয়াসের ফল এই বই।

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর আমন্ত্রণে আমরা ক'জন সংবাদিক ক'বছর আগে পশ্চিম জার্মানী দর্শনে গিয়েছিলাম। চোখ ও মন খোলা রেখে অনেক দেখেছি। যা ভালো লেগেছে, তারই খণ্ড খণ্ড ছবি এঁকেছি। এ ছবির অনেকগুলিই দৈনিক 'জনসেবকে' প্রকাশিত হয়েছে। যখন লিখি, তখনই মনে হয়েছে, আমাদের মত আত্মসংগঠনকামী দেশের পক্ষে এই নতুন জার্মান-চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। সেই বোধেই এই সঞ্চয়ন ও সঞ্চয় গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ। জার্মান জাতির দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তির সম্যক পরিচয়ের যদি কিছুও অনুধাবন ও প্রকাশ করতে পেরে থাকি এবং তা যদি আমাদের দেশের যুবচিত্তকে কিছুমাত্র উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, জার্মানী ভ্রমণে তাই আমার পরম পাওয়া।

'নতুন শহর, নতুন মানুষ' পর্যায়েই এ লেখাগুলি মূলতঃ লিখেছিলাম। অবশ্যই জার্মানীর এ সব শহর আদৌ নতুন নয়, মানুষও নতুন নয়। তবে আমার চোখে নতুন। তা'ছাড়া বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর আজকের জার্মানীও ত নতুন

করেই গড়ে উঠেছে। বলতে কি, জার্মানীর মানুষেরও নবজন্মান্তর ঘটে গিয়েছে। সে বিচারই মুখ্য।

আমার জার্মানী দেখার পর অনেকগুলি দিন কেটে গিয়েছে, এর মধ্যে জার্মানীর সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বার্লিন তথা জার্মানী নিয়ে আরো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সে সব এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। আগাগোড়াই একটা ভিন্ন সুরে জার্মানীর কথা বলতে চেয়েছি ; বলতে চেয়েছি এজন্যই যে স্বাধীন ভারতের এই আত্মসংগঠনকামী জার্মান জাতির কাছ থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে। শিক্ষার্থীর মন নিয়ে আমি গিয়েছিলাম ; আমার কামনা, যাঁরা এ গ্রন্থ পাঠ করবেন, তাঁরাও জার্মানীর এই আত্মসংগঠনের সংগ্রামের কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হবেন।

সব শেষে, আমার এই জার্মানী ভ্রমণের প্রাক্কালে ও অন্তে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর কলকাতাস্থ কনস্যুলেটের তৎকালীন প্রেস অফিসার ডঃ জি. ফিসার ও বন্ধুবর শ্রীঅসীম করের কাছ থেকে যে সব মুল্যবান পরামর্শ ও তথ্য-বিবরণ পেয়েছিলাম, সকৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করছি। সেই সঙ্গে স্মরণ করি সহগামী সাংবাদিক বন্ধু শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী (বার্তা সম্পাদক, আনন্দবাজার), শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য (বিশেষ প্রতিনিধি, যুগান্তর) এবং উড়িষ্যার শ্রীমনোমোহন মিশ্রের সম্প্রীতি ও সাহচর্য। প্রসঙ্গত স্নেহাস্পদ, কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহও উল্লেখযোগ্য।
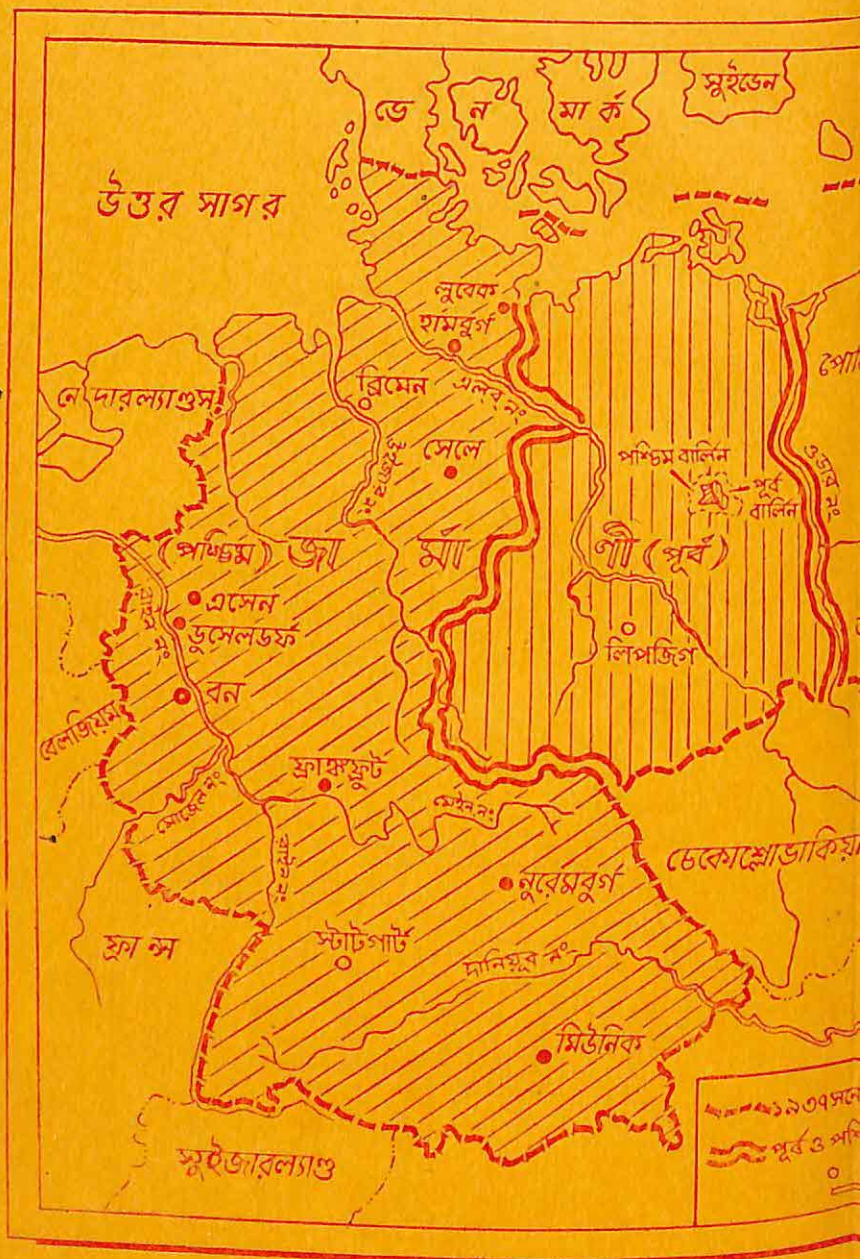
ডেনমার্ক
সুইডেন
উত্তর সাগর
লুবেক
হামবুর্গ
নেদারল্যাণ্ডস
ব্রিমেন
এলব নং
সেলে
পশ্চিম বার্লিন
পূর্ব বার্লিন
(পশ্চিম) জার্মানী (পূর্ব)
এসেন
ডুসেলডর্ফ
বন
লিপজিগ
বেলজিয়ম
ফ্রাঙ্কফুর্ট
মেইন নং
চেকোশ্লোভাকিয়া
নুরেমবুর্গ
ফ্রান্স
স্টাটগার্ট
দানিয়ুব নং
মিউনিক
সুইজারল্যাণ্ড
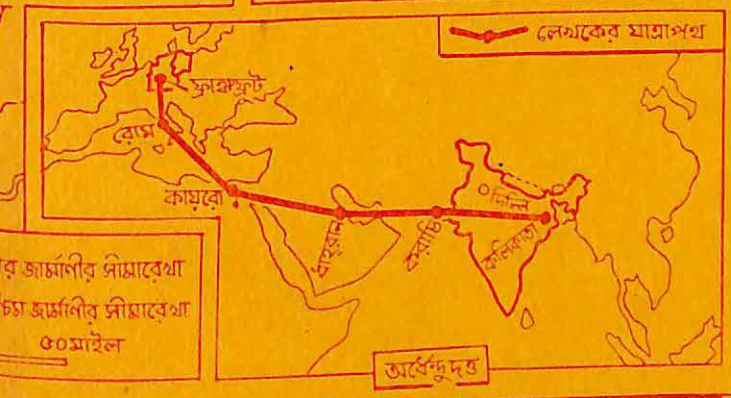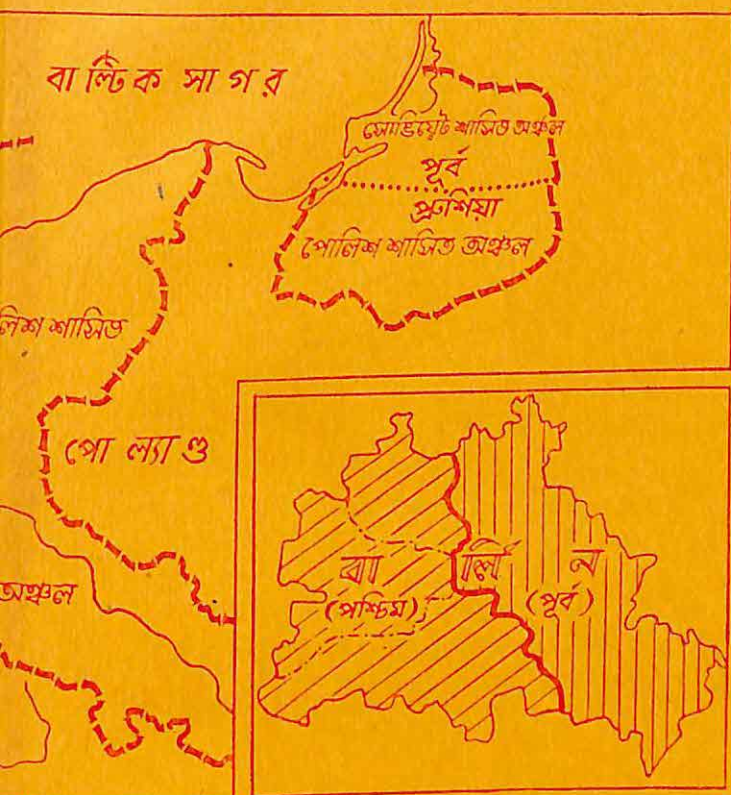
জার্মানীর নব রূপায়ণ

নতুন জার্মানী। আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। আমরা বলি পশ্চিম জার্মানী। ওঁরা বলেন ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী [বুণ্ডস্ রিপাবলিক ডয়েটস্ ল্যাণ্ড]।

১৯৬২-র মে মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে এই নতুন জার্মানীর কর্মকাণ্ড দেখে এসেছি। যেখানে গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য ; আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্য।

চমক লেগেছে, মুগ্ধ হয়েছি, অভিভূত হয়েছি। কিন্তু তা প্রথম প্রথমই। ঠিক যাকে বলে বিস্মিত হওয়া, তেমন বিস্মিত হইনি। বিস্মিত হইনি একমাত্র এই কারণেই যে, এরকম প্রচণ্ড কর্মশক্তির জয় অনিবার্য, সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এ জাতি আত্মপ্রত্যয়ী হবে না ত কে হবে ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলই, এমন কি ঘরবাড়ী, কল-কারখানা, শিল্প-সম্পত্তি—এককথায় সমগ্র জার্মানী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে আর ক'বছর আগের কথা? ১৯৪৫-এ জার্মানীর সম্পূর্ণ সামরিক পরাজয় ঘটে। তারপর এই ১৫।১৬ বছরের মধ্যেই এক নতুন জার্মানীর উদ্ভব ঘটেছে। ১৫।১৬ বছরও নয়, বলতে গেলে এ যা-কিছু দশ বছরেরই কর্মকাণ্ডের ফল। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম জার্মান ল্যাণ্ডারগুলি (অনেকটা আমাদের প্রাদেশিক ইউনিটের মত) নিয়ে ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী গঠিত হয়,

আর ১৯৫৫-র মে মাসে এটি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কার্যতঃ নতুন জার্মানী গড়া পূর্ণোদ্যমে সুরু হয় ১৯৫০ সাল থেকেই।

আজকের নতুন জার্মানীকে বুঝতে হলে এই সময়-সীমাটুকু স্মরণ রাখতে হবে, তা না হলে জার্মান জাতির কর্মকাণ্ডের প্রচণ্ডতা, অনিবার্যতা বোধগম্য হবে না। আরো একটা বিষয় স্মরণ রাখা দরকার, তা হলো জার্মানী-বিভাগ। জার্মানী-বিভাগ এঁদের মনে এক প্রচণ্ড ক্ষত সৃষ্টি করেছে। জার্মানীর রাজধানী বার্লিনও দ্বিধাবিভক্ত। তাই 'বন'কে সাময়িক রাজধানী করে এঁরা ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানীর শাসন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। জাঁকজমকে, সমৃদ্ধিতে, ঐশ্বর্যে, নগরজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিরিখে পশ্চিম বার্লিন অতুলনীয়। কিন্তু বিভক্ত বার্লিন নয়, যুক্ত, এক বার্লিনই প্রতি জার্মানবাসীর কাম্য। পশ্চিম জার্মানীর যেখানেই গিয়েছি, সে উত্তরে হামবুর্গেই হোক, বা দক্ষিণে মুনচেন বা মিউনিকেই হোক, সর্বত্রই এই হাসি-উজ্জ্বল আত্মপ্রত্যয়ী জাতির প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই এই এক কামনা উৎসারিত হতে দেখেছি যে, জার্মান এক হোক; এক জার্মানী, এক জার্মান জাতি। এজন্য এঁদের সঙ্কল্পও অটুট, দৃঢ়। এবিষয়ে এঁরা কোন আপস করতে রাজী নন। জার্মানী-বিভাগ প্রতি জার্মানের আবেগ, আকুতির প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

আজকের জার্মানীকে বুঝতে হলে, এ-ছাড়াও আরো যা স্মরণ করা প্রয়োজন, তা হলো দুই জার্মানী ও বার্লিন প্রশ্নে পশ্চিমী শক্তি-গোষ্ঠীর ও সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা। সংক্ষেপে তা হলো এই, ১৯৩৭ সালে যা জার্মান রাইখ নামে পরিচিত ছিল, ১৯৪৫ সালে তা

চারটি দখলদারী অঞ্চলে বিভক্ত হয়। পশ্চিমে ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল এবং পূর্ব ও মধ্য জার্মানীতে সোভিয়েট রাশিয়া অধিকৃত এলাকা। বার্লিনও বিভক্ত হয়ে ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বার্লিন ও পূর্ব বার্লিনরূপে পরিচিত হলো। ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অধিকৃত যে পশ্চিমাঞ্চল, তাই এখন সার্বভৌম ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী। পশ্চিম বার্লিনও এই পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গীভূত। তবে এক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, পার্থক্যও রয়েছে, তবে তা অনেকটা আইনতঃই, কার্যতঃও নয়, নৈতিকও নয়। পশ্চিম বার্লিনের ওপর সাধারণতন্ত্রী জার্মানীর সংবিধান এখনও কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য। আর সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব জার্মানীকে নিয়ে গঠিত হয়েছে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, যাকে সাধারণভাবে বলা হয়—কমিউনিষ্ট পূর্ব জার্মানী। এই পটক্ষেপে আজকের জার্মানীকে বুঝতে হবে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর ঘরবাড়ী শিল্প-সম্পত্তির অপূরণীয় ক্ষতি ত হয়েছিলই, জনবলও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানীতে গিয়ে আজ যুদ্ধের ভয়াবহতা, তার বিধ্বংসীরূপ কল্পনা করাও কঠিন, কারণ আজ তার নব সজ্জা ; তবে সে ক্ষয়ক্ষতির মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া কঠিন নয়। এক হামবুর্গ শহরেই অর্ধেক ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, বন্দর এলাকা বিধ্বস্ত হয়েছিল। একটা মোটামুটি হিসাবে পাওয়া যায়, যুদ্ধকালে ২০ লক্ষের মত অসামরিক লোক নিহত হয়েছিল।

কিন্তু আজ পশ্চিম জার্মানীতে যুদ্ধক্ষত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। পশ্চিম বার্লিনে যুদ্ধক্ষতের কোন চিহ্নই আজ আর দেখা যাবে না, এক সেই ঐতিহাসিক চার্চটি ছাড়া। এই চার্চটি সংস্কার করা হয়নি, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির স্মারকরূপেই সংরক্ষণ করা হয়েছে সম্ভবতঃ।

পশ্চিম জার্মানীর অন্যান্য শহর সম্বন্ধেও এই একই কথা। যে সব মহল্লার ঘরবাড়ী শিল্প-কারখানা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, সে সব স্থানে নতুনভাবে সব গড়ে উঠেছে—ঘর হয়েছে, শিল্প-কারখানা হয়েছে। সর্বত্র প্রাণোচ্ছলতা। অনেক ঐতিহাসিক গৃহসৌধই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রে পুরাতন ধাঁচেই সংস্কার করা হয়েছে। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে নতুন আস্তরণের একটা আভাস এখনো লক্ষ্য করা যায়। তাও হয়ত বেশীদিন লক্ষ্য করা যাবে না। তুষার, জল, হাওয়ায় নতুন পুরাতনের এই পার্থক্য-সীমাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এই হলো আজকের পশ্চিম জার্মানী। বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত দেশ আজ এই ক'বছরের মধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এখানে কোন বেকার-সমস্যা নেই। দারিদ্র্য এখানে নিশ্চিহ্ন। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উচ্চে। ফেডারেল রিপাবলিকের একজন শ্রমিকের গড়পড়তা মাসিক পারিশ্রমিক হলো ৪৫০ ডি এম (৪৯৪।৪৯৫ টাকার মত)।

মোটামুটি বোঝার জন্য ধরা যায় এক ডি এম (ডয়েট্স্ মার্ক) হলো আমাদের একটাকা উনিশ নয়াপয়সা। সিভিল সার্ভিসে চাকুরীয়ার গড়পড়তা আয় মাসিক ৫৫০ ডি এম। ১৯৫০-এ এই গড় আয় ছিল ২৪৩ ডি এম। জার্মানীতে সবচেয়ে কম যিনি আয় করেন, তাঁরও বার্ষিক আয় ৪০০০ ডি এম।

এ-প্রসঙ্গে অবশ্য এও স্মরণীয় যে, পৃথিবীতে যে সব দেশের কর-হার অত্যন্ত বেশী, জার্মানী তার অন্যতম। এখানে, লোক পিছু বার্ষিক কর-ভার হলো ১,১০০ ডি এম ; আর কর-হার হলো শতকরা

৫৩ ভাগ পর্যন্ত। জার্মান মুদ্রা 'ডয়েট্‌স্ মার্ক' প্রচলিত হয় ১৯৪৮ সালে, আর ক'বছরের মধ্যেই এ দুর্লভ মুদ্রার মর্যাদা লাভ করে।

অবশ্য এ পরিচয় জার্মানীর পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধির মাপকাঠি। কিন্তু পার্থিব সম্পদ কি কোনমতে ন্যূন? অভাবগ্রস্ত মানুষ সবচেয়ে আগে যা চাইবে, তা হলো জীবনধারণের উপযোগী উপকরণ। আর তা পূর্ণ হলেই না তবে তার আত্মবিশ্বাস জাগবে। আত্মপ্রত্যয়ই মানুষকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে প্রেরণা দেয়। জার্মানীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কি বিজ্ঞানে, কি শিক্ষায়, কি শিল্পে, সাহিত্যে, কি ভাষার সৌন্দর্যবিধানে জার্মান জাতির অকুণ্ঠ নিষ্ঠা স্বতঃ-উৎসারিত।

বলতে কি, জার্মান জাতি সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আবাল্য। অবশ্যই এ-আগ্রহের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধাবোধও মিশ্রিত ছিল। আর সেজন্যই যখন একদিন এর অত্যাচারী রূপ দেখেছি, তখন দুঃখ পেয়েছি, বেদনা পেয়েছি। বেদনা পেয়েছি এজন্য যে, যে-জাতি প্রাচ্যের সংস্কৃতি, প্রাচ্যের দর্শন, প্রাচ্যের সাহিত্য-সম্পদ সংস্কৃত অনুধাবন করেছে, শুধু অনুধাবনই নয়, শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাশীল মন নিয়ে গবেষণা করেছে, অনুশীলন করেছে, বিশ্লেষণ করেছে, যে সত্য অর্থ প্রাচ্যের শিক্ষাভিমানীরা বিস্মৃত হয়েছিলেন, তা উদ্‌ঘাটন করেছে, সেই জাতিই কিভাবে এমন মরিয়া হয়ে ধ্বংসের ভয়াল খেলায় মেতেছে! বেদনাবোধ করেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই জাতি যে কি দুর্ধর্ষ তা বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্যও করেছি। কালের ভ্রূকুটিতে এই জাতিও মার খেয়েছে। মার খেয়েছে, তবু হতাশ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়িয়েছে। এই আত্মসংগঠনের সংগ্রামের প্রাণধর্মই উপলব্ধি করবার প্রয়াস

পেয়েছি পশ্চিম জার্মানী ঘুরতে গিয়ে। এককথায় বলতে হয়, সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করেছি প্রাণবন্ত জাতির জীবনস্পন্দন।

পশ্চিম জার্মানীর প্রশাসনিক সদর 'বনে' আলোচনা করতে গিয়ে বৈদেশিক দপ্তরের ভারতীয় শাখার ডঃ বোর্ণম্যান বলছিলেন, জার্মানীর এই আত্মসংগঠনের মূলে একটি কারণ হলো বৈদেশিক সাহায্য, যা না হলে আমরা এসব করতে পারতাম না।

ডঃ বোর্ণম্যানের উক্তি নিশ্চয়ই সত্য। পশ্চিমী গোষ্ঠী যথেষ্ট সাহায্য করেছেন নতুন জার্মানী গড়তে। মার্শাল পরিকল্পনায় সাহায্য এসেছে। এ-ছাড়াও জার্মানদের কারিগরি জ্ঞানে দক্ষতা ত ছিলই। কাজেই এই কারিগরি জ্ঞান, আর বৈদেশিক সাহায্য নিশ্চয়ই নতুন জার্মানী গড়ায় অনেকখানিই উপাদান সরবরাহ করেছে। কিন্তু কেবল এই উপাদানেই কি এত দ্রুত দেশ গড়া যায়? তা হলে অন্য দেশের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমায় অবশ্য বিশেষ আয়াস করতে হয়নি। জার্মানীর যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি, একটি প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধ জার্মানদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমরা জার্মান, আমরা বড়, এই বোধ এদের উৎসাহিত করেছে, উদ্দীপিত করেছে, সক্রিয় করেছে, আর তারই ফলশ্রুতি এই নয়া জার্মানী। যুদ্ধে জার্মানীর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি ঘটে গিয়েছিল। যুদ্ধ আজ জার্মান মাত্রেরই নিকট বিভীষিকার মত। এক জার্মান মহিলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, আমরা সন্তান চাই, কিন্তু তা কন্যা। আমি বিস্ময় প্রকাশ করাতে তিনি বললেন, ছেলে হলে যদি সৈনিক হয়, সৈনিক হলে যদি যুদ্ধ হয়, তার চেয়ে কন্যাই ভাল।

অবশ্য এ কথার উত্তরে অন্য কথা বলতে পারতাম। কিন্তু তা অপ্রাসঙ্গিক। যুদ্ধ যে এদের কাছে কিরকম বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে কথাটা বলবার জন্যই এই আলাপটুকুর উল্লেখ করলাম।

জার্মান জাতির কঠোর শ্রম ও আয়াসের ফল এই নতুন জার্মানী। প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধ এই শ্রম ও আয়াস সম্ভবপর করেছে। লণ্ডনে বি বি সিতে জার্মানী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আমি জার্মান জাতির এই জাতীয়তা-বোধের কথাই বলেছিলাম। ইন্টারভিউয়ার পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্ জাতির জাতীয়তাবোধ নেই ?

আমিও স্বীকার করেছিলাম, সব দেশেরই জাতীয়তাবোধ আছে, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এ জাতীয়তাবোধ অনেক সক্রিয় জাতীয়তাবোধ। আমার বক্তব্য আরও ব্যাখ্যা করেছিলাম, জার্মান জাতির প্রচণ্ড সক্রিয় জাতীয়তাবোধই এই নয়া জার্মান গড়ার মূলে।

আমার এ ধারণা নিছক আবেগপ্রসূত নয়। জার্মানীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব অঞ্চলেই ঘুরেছি। শহরে, গ্রামে, কারখানায়, খামারে সর্বত্রই যাতায়াত ঘটেছে। আর দেখেছি, কি প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধ জার্মানদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করছে। কি প্রচণ্ড কর্মশক্তি! কর্তব্যবোধ কি সুগভীর! শিল্প-কারখানায় ত গিয়েছিই, অফিস-দপ্তরেও গিয়েছি। আমি কোথাও দেখিনি, একজনও বে-কাজ বসে আছেন বা দু'জন নিছক গল্প করছেন।

ন্যূরেমবার্গ থেকে গ্রুনডিগের রেডিও টেলিভিশন ট্রান্সমিটার

কারখানা দেখতে গিয়েছি। এক একটা বিভাগে প্রমীলাদের আধিপত্য। আমাদের উপস্থিতি স্বতঃই তাদের কৌতূহল উদ্রেক করেছে। তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছে, চুপিচুপি কথা বলেছে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি, কাজের স্রোতে কোথাও ক্ষণেকের জন্য ছেদ পড়েনি। অত সূক্ষ্ম নির্মাণকাজও একটুও শ্লথ হয়ে যায়নি।

আমি বিশ্বাস করি না, নিছক রুজি-রোজগারের চাহিদা মানুষকে এমন কর্তব্যনিষ্ঠ করতে পারে। বড়ো হেতু দরকার। তবে একথা বলি না যে, কল-কারখানায় নিপুণ, অনিপুণ শিল্পী যারাই কাজ করছে, তারা সবাই সব কিছু ভেবে বুঝে এভাবে কাজ করছে। তা না হতে পারে। কিন্তু এ মৌল ধারণাটুকু নিশ্চয়ই সকলের মধ্যেই রয়েছে যে, আমার দায়িত্ব পালন এজন্যই দরকার যে এই ভাঙ্গা দেশকে গড়তে হবে।

এই ধারণাকেই বলেছি সক্রিয় জাতীয়তাবোধ। জার্মানীর গাঁয়ে কৃষকের সঙ্গে কথা বলেছি, শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছি, সানন্দে লক্ষ্য করেছি, আমরা জার্মান, এই বোধ, এই প্রত্যয় এদের মনে মনে, অন্তরে অন্তরে কতই না সুগভীর!

আজ এই যে পশ্চিম জার্মানী নতুনভাবে গড়ে উঠেছে, তা অল্পায়াসে হয়নি। ফাঁকি দিয়ে—ত্যাগ স্বীকার না করে—কোন দেশই গড়া যায় না, দেশকে বড় করা যায় না। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। জার্মানীর ক্ষেত্রেও হয়নি। যুদ্ধপূর্বকালের জার্মানী আমাদের আলোচ্য নয়। কাজেই সে প্রসঙ্গ তুলবো না। কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী কালে এই জার্মান জাতি কি কৃচ্ছ্র সাধন করেছে, তা অনুভব করলে বিস্মিত হতে হয়। তার্কিকরা বলবেন, বাধ্য হয়ে

করেছে, বিধ্বংসী যুদ্ধ ঘটানোর মাশুল দিতে হয়েছে। আমি বলি, যেখানেই কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন, সেখানেই ত কিছু বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন থাকে, প্রাচুর্য থাকলে কি কেউ কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলে বা দাবী করে? কাজেই ও যুক্তি ওঠে না। দেখতে হবে, যারা কৃচ্ছ্র সাধন করেছে, তারা তা কি ভাবে গ্রহণ করেছে? জার্মানী সম্বন্ধে জার্মানরা দাবী করেন যে, তাঁরা যুদ্ধপরবর্তী কালে যে কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন, তা দেশকে গড়ে তোলবার জন্যই। আজ আর সে প্রয়োজন নেই। আজ সব কিছুরই প্রাচুর্য। তবুও এক দিক দিয়ে আজও দেশের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য জার্মানরা কি ত্যাগ স্বীকার করে চলেছেন না? কর-হার কি তুলনামূলকভাবে প্রচুর নয়?

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, যুদ্ধপরবর্তী কালের কথা। হামবুর্গে সিটি কাউন্সিল বা স্টেট কাউন্সিল যাই বলুন, সেখানে গিয়েছি। তাঁরা নথিপত্র খুলে দেখালেন, ১৯৪৬ সালে হামবুর্গে প্রত্যেক জার্মানের জন্য প্রত্যহ মাত্র তিনখণ্ড মাংসসহ খাদ্য বরাদ্দ ছিল। একখণ্ড সাবান দেওয়া হতো চার সপ্তাহের জন্য। এই সময়ও কিন্তু কাজে শিথিলতা জাগেনি, তা না হলে আজকের সচ্ছলতা আর আসতো না।

অর্থাৎ যে কথা বলতে চাচ্ছি,—জার্মানরা সজ্ঞানে দেশের, জাতির প্রয়োজনে একদিন যেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নীতি-নিয়ন্ত্রণ নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন, তেমনি আবার সেদিনই কঠোর শ্রমের পথকে বরণ করে নিয়েছেন। তবেই না এত অল্প সময়ে এমন নতুন করে দেশটাকে গড়ে তুলতে পারা গিয়েছে। আর এই সব-কিছু সক্রিয় উদ্যোগেরই মূলে রয়েছে প্রচণ্ড সক্রিয় জাতীয়তাবোধ। এ বোধ না থাকলে যতই কারিগরি জ্ঞানে

দক্ষতা থাকুক না কেন, যতই বৈদেশিক সাহায্য সুলভ হোক না কেন, তার অপব্যয় ঘটার, অপচয় হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকতো।

স্বদেশে ফিরে জার্মানীতে তিন সপ্তাহের ইতিবৃত্ত স্মরণ করতে গিয়ে জার্মান জাতির এই জাতীয়তাবোধকেই প্রণাম জানাচ্ছি।

আল্পসের দেশে

জার্মানীর অনেক ছবিই হয়ত ভুলবো, কিন্তু দু'টি ছবি কোনদিন ভুলবো না। এক হলো, তার আল্পস্ পর্বতমালা। (আমি নাম দিয়েছি শ্বেতসুন্দরী। শ্বেতনয়নাদের দেশে শ্বেতসুন্দরী।) আর অপরটি হলো, জার্মানদের অপরিমেয় কর্মশক্তি, সুগভীর কর্তব্যনিষ্ঠা। কাজে ফাঁকি দেওয়া যে কি, জার্মানরা তা জানে না।

বেশ স্মরণ আছে সেদিনের ঘটনাটি। অবশ্য তা কোন ঘটনাই নয়। একটা ছবি। সে ছবিও দেখার মত সন্দেহ নেই, তবে সেজন্য তা মনে রাখিনি। মনে রেখেছি অন্য কারণে। সে কথাই বলি।

জার্মানীতে আমাদের-দেখা প্রথম শহর মিউনিকে সবে পৌঁছেছি। এপ্রিলের শেষ। শহরের প্রধান মহল্লায় ১৫ তলার বিরাট কাইজার হোটেল, তারও উপরের দিকের তলায়—দশতলায় আমার একক ঘর। আমাদের পরিচালক ও দোভাষী হের ভিলস্ আগের দিন সন্ধ্যায় পাখি-পড়া করে পরের দিনের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তা স্মরণ ছিল ঠিকই। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি আমার জানলায় তুষার। তুষার, তুষার, শ্বেতশুভ্র তুষারকুচি। তুষার ঝরছে অবিশ্রান্তভাবে। পেঁজা-পেঁজা ছোট ছোট তুলোর খণ্ড ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশটাও বাদলা। বড় বড় রাস্তাগুলো ভিজে সোপাট। তারই মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ করে ট্রাম চল্‌ছে, বাস ছুট্‌ছে। মেয়ে-পুরুষ, পথচারীরা ছাতা নিয়ে ছুট্‌ছে, চল্‌ছে। সময়? তখন সবে সাড়ে ছ'টা। সাত-সকালেই আল্পস্-সুন্দরী যেন আমার

দ্বারে হাজির। তুষার-ঝরা মিউনিক শহর। এই বসন্ত সূচনায়ও এমন তুষারঝরা বুঝি সব গোলমাল করে দেয়। মনে হয়, এদিন বুঝি আর সূর্যের আলো পাবো না। বাংলাদেশে যখন বৃষ্টি ঝরে, বলি গলা গলা কান্না ঝরে ঝরে পড়ছে। এখানে কি বলবো? এ যেন মেশিন ঘুরিয়ে বরফ—কুচি ছড়িয়ে দিয়ে কেউ মজা দেখছে।

কেমন যেন বাদলা-দিনের আলসেমি আমায় পেয়ে বসে। সকালেই ৫০।৬০ মাইল দূরে একটা উদ্বাস্তু কলোনী দেখতে যাবার কথা। কেবল মনে হয়, যা আবহাওয়া যাওয়া হবে কি? কিন্তু তখনও জার্মান জাতটাকে চিনিনি। সৌখীন হোটেলের দামী বিছানায় হেলা-ফেলা করে শুয়ে শুয়ে তুষার-ঝরা দেখি। বাদলা দিনের আমেজ বুঝি বা আমাকে কিছুটা আনমনা করে তুলছিল। টেলিফোন বেজে ওঠে। দূরভাষিণীর ওপারে হের-ভিলসের কণ্ঠস্বর, হের মিত্র, তৈরী? আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে মিট করছি।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। জানলা দিয়ে নীচে তাকাই। তখনো তুষার ঝরছে আর তারই মধ্য দিয়ে সব কাজে চলেছে। মেয়েদের মাথায় লাল ছাতাও সাদা হয়ে গিয়েছে। নিজেই কেমন লজ্জা পাই। কাজের দেশে কাজের দিনের স্রোত থেকে দূরে থাকার জন্য মুহূর্ত পূর্বের আকাজ্ক্ষা স্মরণ করে লজ্জা পাই।

বাস্তবিকই, এই দু'টি ছবি কোনদিন ভুলবো না। আল্পস, আর কাজের দিনে এই কাজ-পাগল জাতটিকে।

শ্বেত-সুন্দরী আল্পসের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল বিমানেই। রোম ছেড়ে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট চলেছি, সে সময়ই দেখেছিলাম, পাহাড়ের ঢেউ আর ঢেউ; আর সে ঢেউয়ে ঢেউয়ে শ্বেত

আচ্ছাদন। রোদ উঠছিল, মেঘ পেঁজা তুলোর মত ছুটছিল, ছিটিয়ে পড়ছিল। তখন কি জানতাম এই শ্বেত-সুন্দরীই আমায় আকর্ষণ করবে?

শ্বেত-সুন্দরীর আকর্ষণ সারা জার্মান জাতির প্রতিই। দক্ষিণ জার্মানীতে ত কথাই নেই। ক'দিন পর পর ছুটি, তাহলে আর কি, তল্পিতল্পা গোটাও, নৌকোবিহারের জন্য হাল-দাঁড় নাও, বরফ থাকলো ত স্কী করবার সরঞ্জাম নাও, চলো আল্পসে।

সৌভাগ্য বলতে হবে বৈকি, আমার সঙ্গে শ্বেত-সুন্দরীর দৃষ্টি বিনিময় ঘটেছে তার স্ব-রূপেই। এপ্রিল-শেষে, বসন্ত যখন এ দেশে এলো এলো বলে বা কোথাও এসেও গিয়েছে, তখন এ রকম তুষারবৃষ্টি দেখবো ভাবতেই পারিনি। তুষার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। ঝিরঝির করে ঝরছে। মাঠ—পাহাড়ের কোলে মাঠ, গাছ, পাহাড়ের ঢাল সব-কিছুর উপর যেন শ্বেত আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটরটা চলেছে তার স্বাভাবিক দ্রুত গতিতে। যেন সাদা দুধের উপর দিয়ে একটা তীর ছুটে যাচ্ছে। হলো না। উপমাটা যাই হোক, এ দৃশ্য না দেখলে বোঝান যায় না।

আমরা হিমালয়ের দেশের লোক, কাজেই আল্পস্-এর উচ্চতার মহিমা আমাদের কাছে কোন আকর্ষণই নয়। আল্পস্-এর সবচেয়ে উঁচু চূড়াই ত ১৩ হাজার ফুটের মত, আর এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯ হাজার ফুট। কাজেই সে দিক দিয়ে দেখতেও যাইনি। দেখতে গিয়েছি, আল্পস্-সুন্দরীর আকর্ষণ কোথায়? এই যে এত পর্যটক আসছে, এই যে গোটা জার্মান জাতটা ছুটি উপভোগের জন্য আল্পস্-এ ছুটে আসে, এর হেতু কি? এক লহমায় দেখে বিচার করা কি ঠিক? তাই বা বলি কেন, এক লহমার দৃষ্টি-মিলনেই কি মনে হয় না, আমি যেন যুগ যুগ এই কন্যেকেই চিনি, এই কন্যেকেই

কামনা করে এসেছি? আল্পস্-এর সঙ্গে আমার এক লহমার পরিচয়েই আল্পস্-এর সৌন্দর্য-ভাণ্ডার আমার সামনে উপচে পড়েছে।

আল্পস্ ভয়ঙ্কর নয়। পাহাড়ের ভয়ঙ্কর রূপ আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু সে আকর্ষণ মুষ্টিমেয় দুঃসাহসিকের প্রতি আকর্ষণ, দুঃসাহসিক কিছু করার জন্য, কিছু দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ। আল্পস্ ডাকে সুন্দরীর বেশে। শীতে আল্পস্-এর এক সৌন্দর্য; বসন্তে তার ফুল-বাহার; গ্রীষ্মে তার ফুল আর সূর্যালোকে অভিষেক। আমি যে গিয়েছিলাম, তখন আল্পস্-এর ফুলবাহারের সময়ও আসেনি, আর বরফ ঝরাও পুরোপুরি বিরল নয়। ফুল সবে ফুটছে; তুষার ঝরাও শেষ হচ্ছে। সময়টা এই রকম। এ একরকম ভালই হয়েছিল। শ্বেত-সুন্দরীর শুভ্রতাকে বাদ দিলে তার আকর্ষণই নষ্ট হয়ে যেত। তাই না? আবার সূর্যালোক, ফুলও অনেক আদরের। দু'ছবিই দেখেছি। সত্যই আল্পস্-সুন্দরী মনোলোভা।

আল্পস্, আর বিশেষ করে আল্পসের পাদদেশে মিউনিক শহর— এ শহরের জীবনযাত্রা, কাজের দিনে এ শহরের মানুষের কর্মব্যস্ততা—অবশ্য এ সারা জার্মান জাত সম্বন্ধেই সত্য—দেখতে দেখতে এই কথাটিই আমার মনে হয়েছে যে, এমন আনন্দ করতে না পারলে, জীবনকে এমন রসে-রঙে-রূপে উপভোগ করতে না পারলে বুঝি এমন পাগলের মত কাজ করতেও পারা যায় না। আল্পস্ সফরে আমাদের মোটরচালক ছিলেন একজন ব্যাভেরিয়ান। তাঁর হাসিটা আজও যেন শুনতে পাই। হোঃ হোঃ করে হেসে বলেছিলেন, আমরা জালাভরা বিয়ার খাই। এমন প্রাণোচ্ছ্বাস,

এমন জীবন-প্রাচুর্য দেখেছি, আর মুগ্ধ হয়েছি। এ জাতটার সৃষ্টিই যেন বড় কিছু করার জন্য। যখন যুদ্ধে মেতেছে, তখনও লড়িয়ের মত মেতেছে। আবার যখন বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত দেশকে গড়ার ডাক এসেছে, কি অসাধ্য সাধনই না করেছে! দশ বার বছরে পশ্চিম জার্মানী যেভাবে নতুন করে গড়ে উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাসই করতাম না।

লণ্ডনে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জার্মান জাতির এই অসামান্য সাফল্যের মূলে কি রয়েছে বলে আমি মনে করি? উত্তর দিয়েছিলাম, প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধ। প্রচণ্ড সক্রিয় ও উগ্র জাতীয়তাবোধই জার্মান জাতির উন্নতির মূলে। এই উগ্রতা বিপথচালিত হয়ে ধ্বংসও ডেকে এনেছে একদিন, আবার এই উগ্রতাই নতুন করে দেশ গড়াও সফল করে তুলেছে আজ।

আমার বারবার মনে হয়েছে, জার্মানীর প্রকৃতিও জার্মান জাতির এই প্রচণ্ড জীবনীশক্তির জন্য কম দায়ী নয়। আল্পস্ আমি দেখেছি। জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেষ্ট দেখি নি। কিন্তু এই যে ভয়াল-মধুর প্রকৃতি, এই প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সখ্য জার্মান জাতিকে অনেকখানি গড়েপিটে নিয়েছে। আমি ভিন্ন দেশ থেকে গিয়েছি—আল্পস্ সুন্দরীর বেশে আমায় আকর্ষণই করেছে, দু' দশ দিন অতিথি সৎকার করেছে তুষার ঝরিয়ে, টিউলিপ ফুটিয়ে; কিন্তু বছর ভরে ঋতুতে ঋতুতে নানান্ শোভায়, শীত আর ঠাণ্ডায় সোহাগভরে জার্মান জাতকে গড়ে তুল্ছে।

আল্পস্ জার্মানীর কর্মকাণ্ডের পরিধির বাইরে শোভা নয়, ব্ল্যাক ফরেষ্ট বা কৃষ্ণ-অরণ্য সাজ নয়—জার্মান জাতির বিপুল প্রাণশক্তির

উৎসস্বরূপ। প্রকৃতি আর মানুষে এমনি মিলনেই বুঝি জাতি বড় হয়।

আল্পস্-সুন্দরী আর আল্পস্-এর দেশের মানুষের প্রচণ্ড জীবনী-শক্তিই আজ বার বার স্মরণ করছি, আর অনুভব করছি, শ্বেতসুন্দরী, শ্বেতনয়নাদের দেশে শ্বেতসুন্দরী আল্পস্ আমার অন্তরের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

ছুটির মিউনিক

শুভায় ভবতু। জার্মানীর মাটিতে প্রথম পা দিয়েই আমার মনে পড়েছে, আসবার সময় আমার ছোট্ট ভাগনীটি—তুলতুল আমার পোড়খাওয়া কপালে দৈ-এর ফোঁটা এঁকে দিয়েছিল। পশ্চিম জার্মানীতে আমাদের দেখা প্রথম শহর মিউনিকের পালা শেষ করে যখন পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছি, তখন স্বতঃই মনে হয়েছে, এ যাত্রা আমার শুভারম্ভই হয়েছে। প্রথম মিউনিক দর্শনের ফলে খাঁটি জার্মান জাতটাকে অনেকখানি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। নতুন শহর আর নতুন মানুষের জনারণ্যে হারিয়ে যাই নি। প্রীতি পেয়েছি, শ্রদ্ধা পেয়েছি। শ্রদ্ধা করেছিও। অবশ্য এ জাতটার প্রাণশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বরাবরই ছিল। বাস্তবিক, যখন জার্মানী আসার কথা হয়, দ্বিধা হয় নি, সঙ্কোচ হয় নি, অনভ্যস্ত পরিবেশ বলে আশঙ্কা হয় নি। হয় নি এজন্য যে, ভারত সম্বন্ধে জার্মান জাতিগতভাবে শ্রদ্ধাশীল। এজন্যই তখন মনে মনে একটি কামনাই করেছি, আমার দেশকে আমি যথার্থভাবে উপস্থিত করতে পারবো তো? প্রতিনিধিত্ব করতে পারবো তো? কিন্তু সে সব বিচার ভিন্ন কথা। কেবল এই কথাই বলবো, মিউনিক শহরে ক'টা দিন যে কাটিয়ে এসেছি, সে দেখা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। 'ভিডারজেন'—আবার দেখা হবে বলতে পারলে খুশী হতাম, মিউনিক সুন্দরীও খুশী হতো। কিন্তু না আর দেখা হবে না। কিংবা কে বলতে পারে? তবে দেখা হোক বা না হোক, মিউনিকের অভিজ্ঞতা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

এমন সময়ে মিউনিকে গিয়েছি যখন কেবল ছুটি, ছুটি, ছুটি।

তার জন্য ওখানকার ঐতিহাসিক যাদুঘর, ওখানকার আর্ট গ্যালারি দেখা হয় নি। সে কারণে অনুশোচনা রয়েছে। কিন্তু ছুটির দিনে যাওয়ার জন্যও মিউনিকের যে রূপ দেখেছি, তাও কি কম দুর্লভ? না, শহরের চাকচিক্য, তার ঐশ্বর্য, তার বিলাস-বাহুল্য, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ, এ সবের কথা বলছি না। সে তো ইউরোপের যে-কোন শহরই আমাদের চোখে অলকাপুরী। না, তা দেখেছি নিশ্চয়ই, তবে সেজন্য আমি আগ্রহান্বিত নই, ছিলামও না। আমার সঙ্কল্প ছিল, আমি যে ক'দিন ও-দেশের মাটিতে থাকবো, আমি জার্মান জাতটার প্রাণশক্তির উৎস, তার জীবন-প্রাচুর্য, তাই সন্ধান করবার চেষ্টা করবো, অনুভব করবার প্রয়াস পাব। তাই করেছি।

বলেছি, মিউনিক শহরে যে কটা দিন কাটিয়ে এসেছি, তা ছুটিরই দিন। গিয়েছিলাম শনিবার ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬২। শনিবার, রবিবার ছুটি। কেবল সোমবার কাজের দিন। মঙ্গলবারও ছুটি, ১লা মে, মে দিবস। তাই যে মিউনিকের সঙ্গে বেশী করে পরিচয় হয়েছে, তা ছুটির দিনের মিউনিক। এই ছুটির দিনের মিউনিক দেখবার যোগাযোগে জার্মান জাতির মূল বৈশিষ্ট্যটাই চোখে পড়ে গিয়েছে, মনে ধরে গিয়েছে। জাতটা কি প্রচণ্ডভাবে বাঁচতে জানে! এ বাঁচাটা এদের রক্তেই রয়েছে। কাজে যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি ছুটির দিনে জীবনীশক্তি আহরণ করবার জন্যও কি অদম্য ইচ্ছে এদের!

সোমবার কাজের দিন। সকাল সকাল ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়েছে, অজস্র ধারায় তুষার ঝরছে। পথ, ট্রাম-বাস-মোটর, ঘরবাড়ী সব সাদা তুষারে ছাওয়া। স্বতঃই ভেবেছি, আজ বুঝি বেরোনো হবে না, এই আবহাওয়ায় কি কেউ বাইরে যায়? কিন্তু না,

কোথাও বিরতি নেই। হোটেলের জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, সকাল থেকেই কাজে যাওয়ার পালা সুরু হয়েছে। নীরবে যে যার কাজে চলেছে। মেয়েদের মাথায় ছোট ছোট ছাতা, তাও তুষারে ভরে গিয়েছে। ট্রাম চলেছে তো চলেছে। বাস আসছে, যাচ্ছে। পথচারী অফিস যাত্রীরও যাওয়ার বিরাম নেই। কোন অভিযোগ নেই, হৈ-হল্লা নেই, কোন অনুযোগ নেই। পথে সিগন্যালের নির্দেশে পথ পারাপার হওয়া আর যাওয়া—অবিরাম ভাবে জনস্রোত চলেছে।

সেজন্যই বলছিলাম, এ রকম কর্তব্যপরায়ণ, শুধু কর্তব্যপরায়ণ বললে ঠিক বলা হয় না, কর্তব্য সম্বন্ধে এমন দুর্ধর্ষ নিষ্ঠা, এ প্রাণশক্তি ত মাথা সোজা করে দাঁড়াবেই। যুদ্ধ এ জাতটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল, যুদ্ধের স্মৃতি এদের কাছে বিভীষিকার মত, কিন্তু তা নিয়ে এরা বসে বসে কাঁদে নি, এরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ক্ষত নিরাময় করেছে। এই ক'বছর একটা গোটা জাত হিসেবে এরা বাঁচার সাধনা করে এসেছে। বিদেশের, বিশেষ করে আমেরিকার সাহায্য পেয়েছে বৈকি, প্রচুর পেয়েছে। কিন্তু কোন হীনমন্যতা-বোধ এদের আচ্ছন্ন করতে পারে নি। অবশ্যই মিউনিকে আমার সবে জার্মানী দেখা সুরু। এত অল্প দেখে সঠিক তৌল করা যায় না, উচিতও নয়। সে প্রয়াস করলে ভুল করতাম। তবে এটুকু নিঃসংশয়ে তখনই বুঝেছিলাম, এ জাতটা বাঁচতে জানে।

কিন্তু কোন্ কথায় কোথায় চলে এসেছি! ছুটির মিউনিক, এ মিউনিকের চেহারাই আলাদা। লোক নেই, জন নেই, ছুটি ছুটি পরিবেশ। কোথায় গেল সব? সবাই চলেছে ছুটির দিনে পাহাড়ে,

হ্রদে, হ্রদের ধারে ছোট শহরে, গাঁয়ের ঘরে। এমন ছুটি-উপভোগ দেখবার বৈকি! আল্পস্ এই মিউনিকের মানুষের ধমনীতে, মজ্জায়। শ্বেত-সুন্দরী আল্পস্ এদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এরা সে ডাকে কি আগ্রহেই না সাড়া দেয়!

মিউনিক জার্মানীর ঐতিহাসিক শহর। এর সৌধ, এর গীর্জা, এর অট্টালিকার রূপকাঠামোয় সে পরিচয় স্পষ্ট। যুদ্ধে এসবের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু যা আছে, তাও কম নয়। ক্ষতিও এরা পূরণ করে নিয়েছে। মিউনিক শহরের প্রাচীনত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব জমাট হয়নি, সে সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু ব্যাভেরিয়ার প্রাণশক্তি অনুভব করেছি সেদিনই। অনুভব করেছি, আল্পস্ই এই প্রাণশক্তির উৎস। আল্পস্-এর অপার সৌন্দর্য, আল্পস্-এর ঔদার্য এদের, ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের মানুষকে শৈশব থেকে গড়ে তুলেছে—ঋজু, দৃঢ়।

ছুদিন গিয়েছি আল্পস্-এ, ছুদিক দিয়ে, তার মানে ছু-পথে। ছুদিনই ছুটির দিন। আর ছুদিনই দেখেছি, মিউনিক শহরে লোক নেই। সব ছড়িয়ে ছিটকে গিয়ে পড়েছে আল্পস্-সুন্দরীর আকর্ষণে। আল্পস্-এর আকর্ষণ এদের ছুর্বার আকর্ষণ।

মিউনিক শহরটা সম্ভবতঃ জার্মানীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রক্ষণশীল শহর। অন্ততঃ আমাদের সফর পরিচালক হের ভিলস্ সেই রকম বলছিলেন। কিন্তু এ শহরে আনন্দ-বিলাসিতার অভাবও ত নেই। কাজেই ছুটির দিনগুলিতে শহরের রেঁস্তোরা, হোটেলে বিলাস-জীবনের ফোয়ারা ছুটলে বিস্মিত হবার কিছু থাকতো না। কিন্তু না, হোটেলে রেঁস্তোরায় গ্রাহকের অভাব নেই বটে, কিন্তু বিলাস-উচ্ছ্বাস বিরল। অবশ্যই কোন কোন স্থানে খানাপিনা

নাচের বহর দেখবার মত বৈকি। তবু এও লক্ষ্য করবার, মিউনিকবাসী ব্যাভেরিয়ার স্টেট থিয়েটারে বসে সত্যকার সাহিত্য-আনন্দ-রসপিপাসু হিসেবে অপেরা উপভোগ করছে। ছুটির দিনগুলোয় এরা প্রাণপণে জীবনীশক্তি আহরণ করে নেয়, সঞ্চয় করে রাখে। এখানেই আমাদের সঙ্গে এদের তফাৎ।

একদিন মিউনিকের পালা শেষ হয়েছে। হের ভিলস্ তল্পিতল্পা গুটোবার নির্দেশ দিয়েছেন। মিউনিকের অনেক কিছুই দেখা বাকী থেকে গিয়েছে। জার্মান মেয়ে সেপটার টেলিফোন করেছিল, কথা দিয়েছিলাম পারলে দেখা করবো, জার্মান ঘরসংসার দেখতে চাই আমি। দেখা করে আসতে পারি নি। তবে টেলিফোনে আমি তাঁকে 'নমস্কার' শিখিয়েছি। জার্মান মেয়েও উচ্চারণ করেছে, নমস্কার, ভিডারজেন, আবার দেখা হবে। দেখাই হয়নি একবারও, তবু বলেছে, ভিডারজেন।

মিউনিককে আমিও বলে এসেছি, ভিডারজেন, আবার দেখা হবে। মিউনিককে যদিও ভুলি কোনদিন, আল্পস্-সুন্দরী চিরদিন স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। সফেন সমুদ্র। এ শ্বেতরূপ অবিস্মরণীয়। আল্পস্-এরই পাদপীঠে গারমীস্। এই গারমীসেই রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থ' রচনা করেছিলেন। ব্যাভেরিয়ার মাটিতে ধর্মের আকর্ষণ সর্বত্র! ক্যাথলিকের সংখ্যাই বেশী। এদের লোকসঙ্গীতেও ধর্মের স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথ আল্পস্-এর পাদপীঠে বসে যীশুখ্রীষ্টের জীবননাট্য অভিনয় দেখে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

মিউনিকের কথা, বিশেষ করে আল্পস্-সুন্দরীর কথা, লিণ্ডার-হপে পাগলা রাজার প্রাসাদের কথা—যে রাজার খাবার টেবিল

চেনে করে রন্ধনশালায় নামানো হতো, পাচক সব সাজিয়ে দিলে তা আবার তেমনি ভাবে রাজার ঘরে উঠে যেতো, সে সব লেখবার মত। সে সব ছবি ভুলবো না। উদ্‌বাস্তু উপনিবেশের রেঁস্তোরায় সেই তরুণ ওয়েটারটিকেও ভুলবো না, যে বই খাতা খুঁজে এনে আমাদের দেখিয়েছে যে তার এখানে আগেও বাঙ্গালী সাংবাদিক এসেছেন। এ সব আনন্দময় স্মৃতি।

তবে মিউনিক হলো বড় ঘরানার মেয়ে কিংবা সংগীতের আসরে মার্গ সঙ্গীত। আমার জার্মানী দেখা মিউনিক দিয়েই সুরু।

শিল্পী রাজার দুর্গ-প্রাসাদ

কনে-দেখা আলো। হলুদ হলুদ সোনালী রং সারা আকাশটা ব্যেপে ছড়িয়ে পড়ছে। সব কিছুতে যেন রং লাগছে। এমন সময় নাকি সব কন্যেকেই সুন্দর দেখায়। সুন্দর আরো সুন্দরতর হয়।

কিছুক্ষণ আগেই হয়ত ক'ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। সব কেমন স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন। এমন সময় এই নতুন আলো ফুটেছে। এ আলোয় সব কিছুই বুঝি ভাল লাগে।

কনে-দেখা আলোর কথাটা মনে পড়লো জার্মানীর ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের আল্পস্ পর্বতমালার কোলে লিণ্ডারহপ দুর্গের ছবিটি মনে করতে গিয়ে। সুন্দর সৃষ্টির পটভূমিকাটিও সুন্দর হওয়া চাই। তা না হলে সৌন্দর্যের হানি ঘটে। আনন্দের কথা, এখানে প্রকৃতির রূপ-লীলা উদ্বেল, উদ্ভাসিত। আল্পস্ পর্বতের এমন রূপ-সমারোহের মধ্যেই লিণ্ডারহপ দুর্গের সঙ্গে আমার পরিচয়। আর সেজন্যই জার্মানীতে অনেক দেখার স্তর পেরিয়ে এই দেখাটা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আল্পস্-এর এমন অপরিমেয় সৌন্দর্য-সুধা যদি আমার চোখে সেদিন মায়াঞ্জন লাগিয়ে না দিতো, পাগলা রাজা লুইয়ের সৌন্দর্যসাধ অনুভব করতে পারতাম না। তাই বলছিলাম, যেন কনে-দেখা আলোর প্রসাদ অকৃপণভাবে সেদিন সেই মুহূর্তে বর্ষিত হচ্ছিল।

শ্বেতসুন্দরী আল্পস্। বুঝি নিছক পর্বত নয়, একটি জীবন্ত সত্তা। আল্পস্-এর আকর্ষণ অমোঘ আকর্ষণ। যতই আল্পস্-এর কাছাকাছি হয়েছি, রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। সে আকর্ষণ যে

কিসের, তা স্পষ্ট নয়। তা কি ফুলের? তা কি তুষার-ঝরার? তা কি ঐ তুষার-ঝরার মধ্যেই মাঝে মাঝে সূর্যালোকের দাক্ষিণ্য বর্ষণের?

আল্পস্-এর ঢাল বেয়ে বেয়ে উঠেছি, আর এ সবই পেয়েছি। তবে তুষ্যার-ঝরার ভাগটাই বেশী ছিল। ব্যাভেরিয়ার রাজা দ্বিতীয় লুইয়ের প্রাসাদ-দুর্গের এক মহল থেকে অপর মহলে যেতে যেতে মুঠো মুঠো তুষার কুড়োচ্ছি, হাতের তালুতে চাপ দিয়ে গোল-পিণ্ড বল করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি, আর সে কি আনন্দে মজায় আমরা ক'জন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছি! পাগল রাজা লুই প্রাসাদ-দুর্গ তৈরী করবার জন্য উপযুক্ত স্থানই বাছাই করে নিয়েছিলেন। এ রকম জায়গায় মনটা আপনি হালকা হয়ে যায়।

এই শ্বেত-তুষার আস্তরণের উপর যখন মাঝে মাঝে রোদ ঝরছিল, সে কি মহাশোভা! চিক্‌চিক্ করছে; ঝক্‌ঝক্ করছে। আশে পাশে কিছু কিছু গাছে ফুল ধরেছে। মাটিতে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত টিউলিপ ফুটেছে। লাল, লালের ছোপধরা, কত রং বেরং-এর টিউলিপ। এমনি পরিবেশে লিণ্ডারহপ প্রাসাদ-দুর্গে উপস্থিত। এ পরিবেশ না হলে বুঝি এ প্রাসাদ-দুর্গকে মানাতোই না। তাই প্রথমেই কনে-দেখা আলোর কথা বলেছি। এক্ষেত্রে এই পটভূমিকাই কনে-দেখা আলো। প্রকৃতি যেখানে গাইড, সেখানে চোখে এমনি মায়াঞ্জনই লাগিয়ে দেয়, আর এ চোখে সুন্দর আরো সুন্দর হয়ে ধরা দেয়।

লিণ্ডারহপ প্রাসাদ-দুর্গের অবশ্যই একটা ইতিহাস আছে। পাঁচ বছরের কঠোর শ্রমে এ দুর্গ, এ প্রাসাদ তৈরী শেষ হয়েছে ১৮৭৯ সালে। তারপর আর যা সামান্য রদবদল ঘটেছিল, তা ১৮৮৪ সালে, রাজার শয়নকক্ষ বাড়ানো হয়েছিল। দ্বিতল প্রাসাদ-

দুর্গ। ঐতিহাসিক বলতে যে বিশালকায় রূপ স্বতঃই স্মরণে আসে, এ তা নয়। পাহাড়ের ঢাল পথে তেমন কিছু তৈরী করা সম্ভব হলেও তা বেমানানই হতো। পাহাড়ের যে রূপ-বৈভব, তা অক্ষুণ্ণ রেখেই এ প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল এবং লিণ্ডারহপ প্রাসাদের সৌন্দর্য সেখানেই। প্রাসাদের পশ্চাৎপটে অদূরে শৈল-শিখরে বৃক্ষ-শ্রেণী, সমারোহ। তার ওপর তুষার ঝরছে। তবু সবুজ শ্যামলিমা বুঝি সবটুকু ঢাকা পড়ে নি!

দ্বিতীয় লুইকে পাগলা রাজা বলে। পাগল বটে, তবে ভাব-পাগল, স্বপ্নবিভোর পাগল, কল্পনাপ্রবণ পাগল। ১৮৬৪ সালে যখন তিনি ব্যাভেরিয়ার সিংহাসন লাভ করলেন, তাঁর বয়স মাত্র ১৯। তাঁর শৈশব কেটেছে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ। স্বতঃই নির্জনে বসে তিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন। 'লিণ্ডারহপে' তাঁর পিতার একটি শিকার-গৃহ ছিল। রাজা দ্বিতীয় লুইয়ের জায়গাটা খুব পছন্দ। তিনি স্থির করলেন, প্রকৃতির এই কোণেই ঘর তৈরী করবেন, আর এখানেই স্বপ্নজগৎ নিয়ে থাকবেন। রাজনীতি থেকে অনেক দূরে এ তাঁর মনের জগৎ হবে। লিণ্ডারহপ প্রাসাদ-দুর্গের উৎপত্তির এই-ই মূল সূত্র। ১৮৬৯ সালে রাজার বয়স তখন ২৩, তিনি লিণ্ডারহপের চারদিকের জায়গা কিনলেন, আর ঐ বছরই জায়গাটা সমতল করবার নির্দেশ দিলেন। নির্মাণ কাজ আরম্ভ হতে—ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরী করতে করতেই পাঁচ বছর গেল। ১৮৭৪ সালে ঠিক নির্মাণ কাজ আরম্ভ হলো। দ্বিতল দুর্গ-প্রাসাদ রূপ পরিগ্রহ করলো।

রাজার দুর্গ। কিন্তু এ দুর্গ সে দুর্গ নয়। কোন যুদ্ধ-ভীতি,

কোন আক্রমণ-আশঙ্কা এ দুর্গ নির্মাণে প্রণোদিত করেনি। তাই এ দুর্গে যুদ্ধ-সরঞ্জাম অনুপস্থিত। এ দুর্গ-প্রাসাদে শিল্প ও সৃষ্টির প্রাচুর্য। দ্বিতল দুর্গ-প্রাসাদের দ্বিতলে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে গিয়েছি, আর শিল্প-সৌন্দর্যের সমারোহে অভিভূত হয়েছি। এ যেন কোন্ শিল্পী-সম্রাট বিশ্বের যেখানে যা-কিছু সুন্দর আছে তা চয়ন করে এনে এই প্রাসাদ সজ্জিত করেছে, শোভিত করেছে। এক এক কক্ষে কি অপার বিস্ময়ই না আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল! কক্ষের প্রাচীরে শিল্পীর তুলিতে অনবদ্য ছবি ফুটেছে! কত যুগ পার হয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রনৈতিক রদবদলের কত পালা শেষ হয়েছে, কিন্তু এ সব ছবি এক অপূর্ব প্রাণময়তা, সজীবতা নিয়ে আজও দর্শকের প্রীতি উৎপাদন করে চলেছে।

দুর্গের গাইড হেঁকে হেঁকে বলে চলেছেন, শুনুন ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ, ঐ দেখুন, এ কক্ষে প্রভাতকাল চিত্রিত হয়েছে। গাইডের বর্ণনা কিছুটা কানে গিয়েছে, কিছুটা যায়নি। পার্শ্ববর্তিনী জাপানী মহিলা ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখ দুটি তুলে জিজ্ঞেস করেছেন, দেখছেন?

দেখছি বৈকি! সুন্দরের এ বিপুল শোভা-সমারোহ, এ শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করার, বর্ণনার নয়। তবু সব-কিছু পুরাতনই ইতিহাস-আশ্রিত। প্রাসাদে প্রবেশ করবার পূর্বে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে মন ভরে গিয়েছিল, প্রাসাদ-অভ্যন্তরে সে মন যেন পশ্চাৎ দিকে অনেক কাল, অনেক যুগ অতিক্রম করে এমন একটি স্তরে, এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোল, যেখানে দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত গান-ছবি-সুধা ভরা। কিন্তু সে ছবি জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়। এক একটি ভাস্কর্য-নিদর্শন জীবনের এক একটি রূপের প্রতিবিম্ব। শিক্ষা, বিচারবোধ, কৃষ্টি সব-কিছুই এক একটি মূর্তির রূপকে

প্রতিফলিত। সম্পদ, শান্তি, শক্তি মানুষের জীবনে যা-কিছু মহনীয়, সুগভীর নিষ্ঠায় তা প্রতিফলিত করা হয়েছে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। সে সব কক্ষের কি বর্ণনা দেবো? জাঁকজমকে, চাকচিক্যে সে অপরূপ শোভা। ভাব-পাগল রাজা মনের মাধুরী মিশিয়ে এ সজ্জা, এ শোভা রচনা করেছেন। অন্য দুর্গ-প্রাসাদের সঙ্গে লিণ্ডারহপের মৌল পার্থক্যই হলো, এ দুর্গে রাজার, যোদ্ধার দম্ভ অনুপস্থিত। এ যেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁর সমস্ত শিল্প-প্রতিভা দিয়ে এক খণ্ড স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যা কালোত্তীর্ণ, যা চির নূতন। আর আল্পস্ হৃদয়ের স্নেহভাণ্ডার উজাড় করে এই একখণ্ড জগৎকে লালন করে চলেছেন।

এ শিল্প-সৌন্দর্যের মধ্যে একটুকরো খেয়াল হলো রাজার ভোজন-কক্ষ, ডাইনিং রুম। চিত্র-বিচিত্র কক্ষ, কক্ষের দ্বার-দেশে পৌরাণিক কাহিনী চিত্রণ; অগ্নিদানীর ওপর দুটি দর্পণ ঝুলছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে 'জাদু টেবিল'। এ টেবিল ঘর থেকে নামিয়ে রন্ধনশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হত, আর পাচক শতেক ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিলে টেবিলটা আবার স্ব-স্থানে ফিরে আসতো। সুদৃশ্য টেবিল, তার চার পাশে সুদৃশ্য আরামদায়ক চেয়ার।

ভাবছিলাম, প্রায় একশ বছর আগে রাজার আহার কেমন ছিল, পাচক কেমন করেই বা টেবিলটা সাজিয়ে দিত। সে সাজ আজ আর বাস্তব নয়, ইতিহাস। তবে আল্পস্-এর রাজত্বে এ ইতিহাস প্রাণবন্ত, কেবল সে রাজা নেই। জার্মানীতে আজ রাজাই নেই। তবু লিণ্ডারহপ প্রাসাদে তার বিভিন্ন মহলে, সেই কৃত্রিম সুড়ঙ্গ-ঘরে সর্বত্রই ভাব-বিভোর রাজার উপস্থিতির সাক্ষ্য। যেন রাজা

বারেকের জন্য প্রাসাদের বাইরে গিয়েছেন। সুড়ঙ্গ—কৃত্রিম সুড়ঙ্গ-ঘরে এক টুকরো জলাশয়, আর সে জলাশয়ে নৌকো ভাসছে। যেন রাজা একটু পরেই নৌ-বিহারের জন্য আসবেন। আর এক ঘরে পিয়ানো। রাজা লুইয়ের বন্ধু সঙ্গীত-শিল্পী হ্বগ্‌নার। হ্বগ্‌নার ঐ পিয়ানোটা বাজাতেন।

গাইড অনর্গল বলে চলেছেন। এই যে হাতির দাঁতের কারুকার্য-করা শিল্পসম্ভার এও বিদেশের উপঢৌকন। তবে গাইড দেশের নাম করেন নি; সাংবাদিক বন্ধু বলে উঠেছেন, এ নিশ্চয়ই ভারতের। গাইড সম্মতি জানিয়েছেন।

উৎফুল্ল হয়েছি। আনন্দিত হয়েছি। প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে খুশির ঢেউ জেগেছে। ঘরে ইতিহাস, বাইরে রূপসম্ভার। আল্পস্ তার দাক্ষিণ্য উজাড় করে দিয়েছে। রোদ হাসছে। তুষার গলছে। লিণ্ডারহপ প্রাসাদ, এ এক অপরূপ শিল্প! এ শিল্প আস্বাদন অমৃত আস্বাদন। লিণ্ডারহপ দুর্গ-প্রাসাদে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে আমার অমৃত উপভোগ ঘট্‌ছে। রাজা লুই কি কবি ছিলেন না? কবি-মানসের সৃষ্টিলীলায় আজ আমি একাত্ম। আমি মুগ্ধ, আমি অভিভূত।

আল্পস্ সুন্দরী আর লিণ্ডারহপ আমার আগামী দিনের স্বপ্নকে রঙীন করে রাখবে বহুদিন।

এখানেও সন্ধে নামে

এখানেও সন্ধে নামে। ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা আলোর চাকা মাঠ, মাঠের পরে গাছ-গাছালির অরণ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবারের প্রায়-সন্ধে। ট্রেনে ন্যুরেমবার্গ চলেছি। ট্রেনটি আসছে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ শহর থেকে। এঁরা বলেন প্রাহা।

ক'দিন, ক'দিন আর কি, তা হলেও পশ্চিম জার্মানীর দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাভেরিয়া স্টেটের গাঁ অনেক দেখেছি। এ কি আর গাঁ? হাঁ, তবে চাষী চাষ করছে, ঘোড়ায় লাঙ্গল টানছে, তাও দেখেছি। চাষী গিন্নী, মেয়ে, নাতনী মিলে মাঠের কাজে যোগান দিচ্ছে, সাহায্য করছে, তাও দেখেছি। হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো, বিশেষ ধরনের জুতো, মাথায় স্কার্ফ জড়ানো। এ ছবি ক'দিনই দেখছি।

বৃহস্পতিবারের প্রায়-সন্ধে। জার্মানীর মাটিতে সন্ধে নামছে। ধীরে ধীরে সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে। চাষীর ঘরে শেষ বেলার কাজ সারার সাড়া পড়ে গিয়েছে—দেখছিলাম। দেখছিলাম, সম্পন্ন চাষীর ঘরের পাশে মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু পরেই হয়তো চাষী আর চাষী-ঘরনী ন্যূরেমবার্গ রওয়ানা দেবে, সেখানেই আজ রাতের আহার সারা হবে।

না, তাও সবটা ভাবছিলাম না। চিন্তার সূত্র ছিটকে যাচ্ছিল, ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কোন্ লেখকের লেখা একটা বই আছে বাংলায় 'বিলেত দেশটা মাটির।' শিরোনামাটা ঠিক হলো না হয়তো। কিন্তু

সেই কথাটাই মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, এদেশেও সন্ধে নামে।

হের ভিলস্ এসে বললেন, কি ভাবছো? ওকে কি বলবো? ও কি বুঝবে? তবু বললাম, হের ভিলস্, তোমাদের ত এই এত গাঁ-প্রীতি, যাকে বলে countryside-প্রীতি, তোমরা ছুটি-ছাটায় গাঁ ঘরে ছোটো, তুমি কি কখনো পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় গাঁ দেখেছো? হের ভিলস্ হয় ঠিক বুঝলেন না, না হয় ঠিকই বললেন, না, শহরে তো থাকি বেশি। তা ঠিক এরা গাঁয়ে যায়, কিন্তু সন্ধেয় চলে আসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। তাছাড়া এই ঠাণ্ডায় চাঁদের আলো দেখার সাধ হয়ত হয় না; হয়ত এরকমটি হলে আমাদেরও হতো না। কিন্তু তাই কি ঠিক? বাঙালী যেখানেই যাবে, সেখানেই তার বাঙলা দেশের সন্ধে, সন্ধেয় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালা, সীমন্তিনীর দীপান্বিতা রূপের জন্য মন কেমন করবেই।

হের ভিলস্‌কে বললাম, জান, আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে, তা হলো এই সন্ধেয় মেয়েরা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে ঠাকুর প্রণাম করে সকলের মঙ্গল কামনা করে, বিদেশে যে প্রিয়জনরা রয়েছে, তাদের শুভ কামনা জানায়।

হের ভিলস্ হয়তো ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। অন্ততঃ তাই মনে হলো। তাঁর ভাবী পত্নী 'বনে' রয়েছে।

কিন্তু কোন্ কথায় কোথায় চলে এসেছি। উৎকল প্রদেশের সহযোগী সাংবাদিক হঠাৎ বলে উঠলেন, Home, Sweet Home. আমার ঘর, আমার দেশ। তা ঠিক। এই বোধ, এই স্পর্শকাতরতা, এই আকূতি, এই আবেগ না থাকলে জাতীয়তাবোধই থাকতো না।

বুধবারের রাত্রের কথাই ধরা যাক না কেন। জেলবে—জেলব হলো ব্যাভেরিয়া স্টেটের একটা সীমান্ত শহর, মেয়র আমাদের ভোজ-সভায় আপ্যায়িত করলেন। খাওয়ার টেবিলে আলোচনা হচ্ছিল। হের মিগুেল, সিটিমেয়র, হের ভিলস আর আমরা চারজন সবাই আলোচনায় যোগ দিয়েছি। কি প্রচণ্ড বিশ্বাস নিয়েই না হের মিগুেল, হের ভিলস বললেন, তোমরা কমিউনিষ্টদের কাছে সে ঘা খাও নি, তাদের সে রূপ চেনো না, তাই আজও গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনে দাঁড়াতে দাও। আমাদের যা বলার তা অবশ্য বললাম, জানতাম বুঝবে না। ওরা ভাবতেই পারে না, ভারতের গণতন্ত্রের কাঠামোর কি অতুলনীয় মর্যাদা। কিন্তু সে কথা আমার বলার নয়। আমি বলছিলাম কি, নিজের দেশ সম্বন্ধে এই আবেগ, এই আকুতি না থাকলে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড বলিষ্ঠ হয় না, সবল হয় না। জার্মানদের জার্মানী সম্বন্ধে এই আবেগ সত্যই লক্ষ্য করবার মত।

মিউনিক থেকে বুধবার ট্রেনে হোপ, সেখান থেকে জেলবে গিয়েছি। জেলবের খ্যাতি পোর্সেলিন শিল্পের জন্য। আর, হোপ? বোধ হয় ঠাণ্ডার জন্য। কি প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা। এক এক ঝটকা তুষার বৃষ্টিতে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

জেলবে বৃহস্পতিবার হাইনরিচ পোর্সেলিন কারখানা দেখতে যাওয়া হয়েছিল। তবে এ শহরে আমাদের প্রোগ্রাম রাখার বোধ হয় মূল কারণ হল, সীমান্ত অঞ্চল দেখা। হের কলফের সঙ্গে বুধবার গিয়েছিলাম চেকোশ্লোভাকিয়া—পশ্চিম জার্মানী সীমান্তে, আর বৃহস্পতিবার যাওয়া হয়েছিল সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চল,

যাকে আমরা বলি পূর্ব জার্মানী, সেই পূর্ব জার্মানী আর পশ্চিম জার্মানীর সীমান্তে।

এই শেষোক্ত সীমান্তবেষ্টনী জার্মানদের মনে প্রচণ্ড ঘা দিয়েছে। পূর্ব জার্মানীর দিক থেকে কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। হয়তো ওপারে বোন, এপারে ভাই, ওপারের বোন এপারের ভাইয়ের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কইতে পারছে না। হু হু করে সীমান্ত প্রহরীর মোটর সাইকেল ছুটছে। এ পারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, পূর্ব জার্মানীর এলাকার পথ দিয়ে, একান্তই গাঁ-পথ তবে বাঁধানো, মোটর-আরোহী প্রহরী চলে গেল।

বৃহস্পতিবার রাত্রে ন্যুরেমবার্গের হোটেলের গরম ঘরে বসে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে লিখতে লিখতে ভেবেছি, পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলার কথা। এ ক্ষত আমাদের অন্তরের গভীরে। তবু বলবো, জার্মানীর ব্যাপারটি বুঝি অনেকটা ভিন্ন ধরনের।

মিউনিকের পর প্রথম বৃহৎ শহর ন্যূরেমবার্গে গিয়েছি। পথে এই ট্রেনভ্রমণ।

ট্রেনে এ সন্ধ্যা নামার ছবি দেখে আনন্দ পেয়েছি, সন্ধ্যায় মনটা ব্যথায়ও ভরে গিয়েছে। বাঙালীর এই ব্যথাটুকু না থাকলে বাঙালী বাঙালীই থাকে না। তাই বলছিলাম, দেখেছি, এদেশেও একই ধরনের সন্ধ্যা নামে, তবে তুলসীতলা নেই, আর সে সীমন্তিনীও নেই। কিন্তু এদেশের শ্বেতনয়না চাষীঘরনী কি মাতা মেরীর মূর্তি বা ছবির সামনে মাথা নত করে প্রার্থনা করে না? নিশ্চয়ই করে—অন্ততঃ মাতা মেরীর মূর্তি ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র দেখেছি—আর এ কথাটা ভাবতে ভাল লাগছে।

বার্লিন একটা ইতিহাস

বার্লিন। বার্লিন একটা ইতিহাস। এ ইতিহাস ক'দিনে পা করবার নয়। অনেক আয়াস, অনেক প্রযত্ন-প্রয়োজন, তবেই না বার্লিনের অনুচ্চারিত ভাষা বোধগম্য হয়।

তবে বার্লিন যে একটা বিস্ময়, প্রথম সাক্ষাতেই সে পরিচয় পেয়েছি। ন্যুরেমবার্গ থেকে বার্লিন। একটা ভিন্ন পটক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পটক্ষেপে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। ন্যুরেমবার্গ জার্মানীর ঐতিহাসিক শহর, সমস্ত ইতিহাসকে বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যা কিছু অতীতের, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি অক্লান্তই না তার সাধনা। ন্যুরেমবার্গের জীবনযাত্রাও তেমনি—অতীত আর বর্তমানের সংমিশ্রণ। আধুনিক উপকরণ সরঞ্জামের অভাব নেই, কিন্তু প্রাচীনত্বের প্রতি মমতাও কম নয়। এই ন্যুরেমবার্গেই নাৎসী নেতাদের ঐতিহাসিক বিচার হয়েছিল। ন্যুরেমবার্গের মানুষ অবশ্য সে সব আলোচনা পারতপক্ষে করে না।

বার্লিন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বার্লিন অর্থে পশ্চিম বার্লিনের কথাই বলছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরী নূতন ভাবে গড়ে উঠেছে। আর কি অপরূপ রূপ তার। পথ, যানবাহনের প্রাচুর্য, আলোকসজ্জা, অট্টালিকা, সৌধ সবই বিস্ময়কর। বিশেষ করে প্রধান সড়কেরই উপর আমাদের হোটেল 'আম জু'। হোটেলে বসে বার্লিন দেখলে সুখী, সমৃদ্ধ, অত্যুজ্জ্বল বার্লিনই কেবল চোখে পড়ে। কিন্তু বার্লিনের এই-ই পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। বার্লিনকে এক লহমায় ঘুরে দেখে আমার একটি কথাই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, বার্লিন ব্য বেদনা, আনন্দ, সমৃদ্ধি, শ্রম, কাজ, জীবন উপভোগ, সব

কিছুর সংমিশ্রণে গড়া। কিন্তু সব যেন কম্পার্টমেন্ট ভাগ করা। কিন্তু সত্যই কি জীবনটাকে কম্পার্টমেণ্টে ভাগ করা যায়?

প্রধান সড়কের—যাকে বলে বুলওভার—পাশে দাঁড়িয়ে মনেই হয় না, এই বার্লিনই আজকের বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাস্থল। কেবল মনে হয়, অনাবিল আনন্দ, জীবন উপভোগই বুঝি শেষ কথা। না, তা নয়। বার্লিনে সন্ধ্যায় আসা; পরের দিনই সকালে ঘুরতে গিয়ে যে ছবি দেখে ফিরেছি, তারপর থেকে বারবার একটি প্রার্থনাই উচ্চারণ করেছি, এই বেদনাজনক কৃত্রিম ভাগের অবসান ঘটুক, এই বিভাগ শেষ হোক। কিন্তু রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বড় নির্মম। যে সমস্যা অত্যন্ত সরল সহজ, সেই সমস্যাকেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা করে তোলা হয়েছে, হচ্ছে, হবে। আর বলি হবে সাধারণ মানুষ, যে মানুষ দেশ নির্বিশেষে ব্যথায় কাঁদে, যে মানুষ স্বস্তি চায়, শান্তি চায়, সম্প্রীতি চায়।

পশ্চিম বার্লিনের সীমান্তে গিয়েছি। পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব বার্লিনের দিক থেকে কাঁটা তারের বেড়া, প্রাচীর তোলা হয়েছে। কি বেদনাময় দৃশ্য। বেলা ১২-৩০মিঃ। পশ্চিম বার্লিনের দিক থেকে উদ্বেগাকুল আত্মীয় স্বজন বাইনোকুলার নিয়ে ওপারের আপনজনদের দেখবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সব কিছু ঘিরে যেন ভীতির রাজ্য। আমরা যেমন সময়ে সময়ে কার্ফু অবস্থা দেখেছি, এ তেমনই। কিন্তু এ কার্ফু অবস্থা সহজে মোছবার নয়, এই তফাৎ। পূর্ব বার্লিনের যে সব বাড়ী পশ্চিম বার্লিনের এলাকা ঘেঁষে সে সব বাড়ীর এ দিকের দরজা জানলা ইঁট দিয়ে সিমেণ্ট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারের বেষ্টনী, কাঠের পাটাতন, দীর্ঘ বিরাট

প্রাচীর ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রহরী মোতায়েন প্রাচীরের ধারে ধারে।

ব্রাণ্ডেনবার্গ তোরণ। বার্লিনের গৌরব ও গর্বের তোরণ। উপায় নেই, উপায় নেই। পশ্চিম বার্লিনের দিকে প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়েছে। উঁচু প্রহরীকক্ষেও উঠে দেখেছি, পূর্ব বার্লিনের দিকেও ত গেটের কাছে লোক নেই, জন নেই। সব যেন খাঁ খাঁ করছে।

বার্লিনের জীবনের ক'টা বিভাগ আমার মনে হয়েছে। কোন ভাগটাই বিন্দুমাত্র অসত্য নয়, অবাস্তবও নয়। এক হলো, ঐশ্বর্যময় জীবন। হোটেলের অলিন্দে দাঁড়িয়ে যা স্বতঃই লক্ষ্য করা যায়, উপভোগ করা যায়। আর এক হলো, পশ্চিম বার্লিনের সীমান্তে, যেখানে পূর্ব বার্লিনের প্রাচীরবেষ্টনী মোতায়েন সেখানকার জীবন,—যেন হঠাৎ পথ হারিয়ে মরুভূমির মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। তবে ওয়েসিস বলো, মরুস্থান বলো, পশ্চিম বার্লিনের দিকে সীমান্তের বসতি, বাস, ট্রাম, কিছু কিছু দোকান সম্ভার। কিন্তু একটা দিক বন্ধ, নীরব, স্তব্ধ, সমাধিস্থানের মত শান্ত। সেখানে ঐ সীমান্তে পশ্চিম বার্লিনের যে সব মানুষ চলাফেরা করছে, তাদের মন ব্যথাতুর। দেখেছি, পথে দু তিন জায়গায় ক্রশ দাঁড় করানো, তাতে ফুলের মালা দেওয়া। এর একটি হলো যে মহিলাটি পূর্ব বার্লিনের দিকের বাড়ীর ছাদ থেকে এদিকে লাফ দিয়ে পড়ে বাঁচতে চেয়েছিল, তার স্মরণে নির্মিত।

দেশ বিভাগের বেদনা আমাদের অজানা নয়। পশ্চিম বাঙলা পূর্ব বাঙলার ক্ষত আমাদের মনের অত্যন্ত বেদনাস্থল। কিন্তু বুঝি

যাকে আমরা বলি পূর্ব জার্মানী, সেই পূর্ব জার্মানী আর পশ্চিম জার্মানীর সীমান্তে।

এই শেষোক্ত সীমান্তবেষ্টনী জার্মানদের মনে প্রচণ্ড ঘা দিয়েছে। পূর্ব জার্মানীর দিক থেকে কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। হয়তো ওপারে বোন, এপারে ভাই, ওপারের বোন এপারের ভাইয়ের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কইতে পারছে না। হু হু করে সীমান্ত প্রহরীর মোটর সাইকেল ছুটছে। এ পারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, পূর্ব জার্মানীর এলাকার পথ দিয়ে, একান্তই গাঁ-পথ তবে বাঁধানো, মোটর-আরোহী প্রহরী চলে গেল।

বৃহস্পতিবার রাত্রে ন্যুরেমবার্গের হোটেলের গরম ঘরে বসে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে লিখতে লিখতে ভেবেছি, পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলার কথা। এ ক্ষত আমাদের অন্তরের গভীরে। তবু বলবো, জার্মানীর ব্যাপারটি বুঝি অনেকটা ভিন্ন ধরনের।

মিউনিকের পর প্রথম বৃহৎ শহর ন্যুরেমবার্গে গিয়েছি। পথে এই ট্রেনভ্রমণ।

ট্রেনে এ সন্ধ্যা নামার ছবি দেখে আনন্দ পেয়েছি, সন্ধ্যায় মনটা ব্যথায়ও ভরে গিয়েছে। বাঙালীর এই ব্যথাটুকু না থাকলে বাঙালী বাঙালীই থাকে না। তাই বলছিলাম, দেখেছি, এদেশেও একই ধরনের সন্ধ্যা নামে, তবে তুলসীতলা নেই, আর সে সীমন্তিনীও নেই। কিন্তু এদেশের শ্বেতনয়না চাষীঘরনী কি মাতা মেরীর মূর্তি বা ছবির সামনে মাথা নত করে প্রার্থনা করে না? নিশ্চয়ই করে—অন্ততঃ মাতা মেরীর মূর্তি ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র দেখেছি—আর এ কথাটা ভাবতে ভাল লাগছে।

বার্লিন একটা ইতিহাস

বার্লিন। বার্লিন একটা ইতিহাস। এ ইতিহাস ক'দিনে পা করবার নয়। অনেক আয়াস, অনেক প্রযত্ন-প্রয়োজন, তবেই না বার্লিনের অনুচ্চারিত ভাষা বোধগম্য হয়।

তবে বার্লিন যে একটা বিস্ময়, প্রথম সাক্ষাতেই সে পরিচয় পেয়েছি। ন্যুরেমবার্গ থেকে বার্লিন। একটা ভিন্ন পটক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পটক্ষেপে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। ন্যুরেমবার্গ জার্মানীর ঐতিহাসিক শহর, সমস্ত ইতিহাসকে বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যা কিছু অতীতের, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি অক্লান্তই না তার সাধনা। ন্যুরেমবার্গের জীবনযাত্রাও তেমনি—অতীত আর বর্তমানের সংমিশ্রণ। আধুনিক উপকরণ সরঞ্জামের অভাব নেই, কিন্তু প্রাচীনত্বের প্রতি মমতাও কম নয়। এই ন্যুরেমবার্গেই নাৎসী নেতাদের ঐতিহাসিক বিচার হয়েছিল। ন্যুরেমবার্গের মানুষ অবশ্য সে সব আলোচনা পারতপক্ষে করে না।

বার্লিন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বার্লিন অর্থে পশ্চিম বার্লিনের কথাই বলছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরী নূতন ভাবে গড়ে উঠেছে। আর কি অপরূপ রূপ তার। পথ, যানবাহনের প্রাচুর্য, আলোকসজ্জা, অট্টালিকা, সৌধ সবই বিস্ময়কর। বিশেষ করে প্রধান সড়কেরই উপর আমাদের হোটেল 'আম জু'। হোটেলে বসে বার্লিন দেখলে সুখী, সমৃদ্ধ, অত্যুজ্জ্বল বার্লিনই কেবল চোখে পড়ে। কিন্তু বার্লিনের এই-ই পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। বার্লিনকে এক লহমায় ঘুরে দেখে আমার একটি কথাই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, বার্লিন ব্য ঃ বেদনা, আনন্দ, সমৃদ্ধি, শ্রম, কাজ, জীবন উপভোগ, সব

এ ভাগ, এই বাধা-প্রাচীর আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এক জায়গায় দেখি সীমান্ত প্রাচীরবেষ্টনীর পশ্চিম বার্লিনের দিকের দেওয়ালে প্রচুর ফুলের মালা লাগানো। মালাগুলি শুষ্ক, বিবর্ণ। এ মালা কারা লাগিয়েছে? কেন? না, ওপারে সমাধিভূমি রয়েছে। এপারের মানুষ ওপারে যেতে পারে না, অথচ ঐ সমাধি-ভূমিতে এদের আত্মীয়স্বজন শেষ শয্যায় শায়িত। কাজেই তাদের স্মরণে এপারে দেওয়ালে মালা বিলম্বিত হয়েছে।

এই হলো, বার্লিনের সবচেয়ে বেদনার্ত দিক। ঐশ্বর্য উপকরণের অভাব নেই, কিন্তু বার্লিনবাসী কিছুতেই ভুলতে পারে না, তাদের মধ্যে কৃত্রিম বেষ্টনী খাড়া করে তাদের বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

এ বেষ্টনী, এই বিভাগ, এই ঠাণ্ডালড়াই, এই রাজনীতি যথেষ্ট আলোচনার বিষয়। নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন ওঠে, বার্লিন সমস্যা কি সত্যই সমাধানের অতীত? এ সমস্যা কি আদৌ কঠিন? তবে কেন এই সমস্যা অব্যাহত থাকছে? কার স্বার্থে? আলোচনায় অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গ ওঠে। এ সব কথা বহু বার্লিনবাসীর মনেও উঠেছে। কিন্তু কেউ তা বলে না। বলে না এজন্য যে, তারা আর আঘাত খেতে চায় না।

বার্লিনের জীবনের আর একটি রূপ দেখেছি। তা হলো ছুটির দিনের রূপ। এ বুঝি জার্মানীর সব অঞ্চলের মানুষ সম্বন্ধেই সত্য। মিউনিকে দেখেছি, ছুটির দিনে গোটা শহরটা আল্পসের পাদদেশে ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বালিনের সীমা সীমিত। তবে, পাহাড়ও বোধ হয় নেই। কিন্তু হ্রদ আছে অনেকগুলি। সুন্দর

সুন্দর হ্রদ, পার্ক, কিছু কিছু বনাঞ্চল, সুন্দর সুন্দর রেঁস্তোরা, শহরের উপান্তে ছোট ছোট কটেজ। আর ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়ার মত মন আর মোটর যান। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল সে রবিবার। এরকম ছুটির দিন কমই আসে। টিউলিপ ফুল ফুটেছে, গাছে গাছে নতুন পাতা। বসন্তকাল। জীবনকে উপভোগ করবার এই ত সময়। রঙে, রসে ভরপুর জীবন। এ জীবন-উপভোগ আমাদের কারোর চোখে বা বিসদৃশ লাগতে পারে। আমার লাগেনি। যেমন কর্মঠ, তেমনি জীবনকে উপভোগে পটু। একটা পূর্ণ জীবন।

জীবনের এই রূপ দেখেছি, আর মোহিত হয়েছি। বার্লিন প্রথম আমায় বিস্মিত করেছে, পরে আমায় বেদনার্ত করেছে, তারও পরে আমায় মোহিত করেছে। এই বার্লিন। বার্লিনের এক একটা কম্পার্টমেণ্ট—এক কম্পার্টমেণ্ট ঐশ্বর্যভরা ; এক কম্পার্টমেণ্টে অশ্রু ; এক কম্পার্টমেণ্টে জীবনকে উপভোগ করার রসায়ন। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই কি একটা মিলন সেতু নেই ? আছে। আর তাই হলো প্রাণকেন্দ্র। তা হলো প্রচণ্ড জীবন-প্রাচুর্য। এ জীবনীশক্তি না থাকলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বার্লিন আজকের ইউরোপের অন্যতম সেরা নগরী বলে খ্যাত হতে পারতো না।

এই জীবন-প্রাচুর্যই নিরীক্ষণ করে এসেছি। বার্লিন নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটাতে হলে এই জীবন-প্রাচুর্যকেই স্বীকার করে নিতে হবে, মূল্য দিতে হবে। বার্লিনবাসী নৈরাশ্যবাদী নয়, তাদের বিপুল আশা যে বার্লিন বিভাগ রদ হবেই। কিন্তু কোন্ পথে, তা বড় একটা কেউ বলতে পারে না।

সে কথা থাক। রাষ্ট্রনীতির কথা ভিন্ন কথা। তার জন্য অনেক বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন। তবে বার্লিনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলবো, বার্লিন অপরূপা। বার্লিন জীবন।

ভিডারজেন

অত্যন্ত সপ্রতিভ সেই মেয়েটিকে প্রথম দেখে চম্‌কে উঠেছিলাম। যতই পরিবেশ ভিন্নতর হোক, হোক না কেন আজকের ঐশ্বর্যময়ী পশ্চিম বার্লিনের একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ, অকস্মাৎ যেভাবে সেই সন্ধ্যায় শ্বেতনয়না স্টিলকা আমাদের টেবিলে এসে বসেছিল, আর বসেই এই, এই, তুমি কী কী দেখলে—বলে কথা সুরু করে দিয়েছিল, আমাদের পকেট থেকে নোটবই কেড়ে পূর্ব বার্লিনের দ্রষ্টব্য স্থানের ফিরিস্তি লিখে তা কণ্ঠস্থ করাতে, আর সবচেয়ে বড় কথা, কোন জার্মান মেয়েকে কিভাবে স্তুতি জানাতে হয়, তার পাঠ দিতে সুরু করেছিল, তাতে আমাদের মত অনভ্যস্তদের চমকে উঠবার কথাই বৈকি। তবে চমক লাগলেও বিরক্তি লাগেনি। বরং ভালই লেগেছে, অনেকক্ষণ ধরে শ্বেতনয়নার সঙ্গে কথা কাড়াকাড়ি করতে মজা লেগেছে, আমোদ লেগেছে। জার্মান ভাষায় ডার্লিং হ'ল লিপলিং। লিপলিং, তোমায় সুন্দর দেখাচ্ছে। সেই সন্ধ্যায় জার্মান মেয়ে শ্বেতনয়নার কাছ থেকে কি উৎসাহেই না পাঠ নিতে সুরু করেছিলাম আমরা ক'জন। স্টিলকারও কি সে উৎসাহ! সরাসরি বিমান-বন্দর থেকে এসেছে। বিমান-সেবিকার পোশাক অঙ্গে। মজা পেয়ে আর আমোদে খিল খিল করে হেসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগটি টেবিলে রাখা। আমার নোটবুকে গোটা গোটা করে নাম লিখ্‌ছে—স্টিলকা। সহঃবন্ধু ঈর্ষার ভান করেছে, লিপলিং, তুমি পার্শিয়ালিটি করছো। স্টিলকা ধমক দিয়েছে, ওরকম হিংসে করতে আছে? তার চেয়ে ভালভাবে মুখস্থ করো, ভী শ্যোন ডু বিষ্ট, লিপলিং; ভী শ্যোন ডু বিষ্ট, লিপলিং।

আঃ, কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে ডার্লিং। সহঃবন্ধু মজা পেয়েছে, কতকাল মুখস্থ করার পাট উঠিয়ে দিয়েছিল, নতুন করে সেই চমক-লাগানো বার্লিন নগরীর রেঁস্তোরায় বসে পাঠ নিতে সুরু করেছে। [জনান্তিকে বলে রাখি আমরা এ বিদ্যে জার্মানীর কোথাও প্রয়োগ করিনি ; তবে এক সহঃবন্ধু পূর্ব বার্লিনে যুদ্ধ-স্মারক স্তম্ভ দেখতে গিয়ে এক বৃদ্ধা গ্রাম্য মহিলাকে উদ্দেশ করে একবার বলেছিল, লিপলিং···। আর সে বুড়ির কি ফোকলা হাসি !]

জার্মান মেয়ে স্টিলকা, আর আমরা ক'জন—আমাদের ঘিরে সে সন্ধ্যার আসর ক্ষণে ক্ষণে হাসির গমকে আর চমকে ও জার্মান ভাষা রপ্ত করার ভুল উচ্চারণে পাশাপাশি অনেককেই বুঝি কৌতূহলী করে তুলছিল। কিন্তু এমন আনন্দ-ভরা সন্ধ্যাও দ্রুত রাতের গভীরে নিঃশেষ হয়ে গেল। রাতের আহার সেরে স্টিলকাকে বিদায় দিলাম, আর পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, ভিডারজেন, আবার দেখা হবে।

আবার দেখা হয়েছিল, বিলম্বে নয়, মাত্র ক'ঘণ্টা পরেই। সেই এক হোটেল-রেস্তোরাঁয়ই। তবে কিছু ভিন্ন পরিবেশে। এসেছে আদেশ, বন্দরের কাল হলো শেষ। বার্লিনে এই শেষ দিন। আর ঘণ্টা দু-তিন পরেই বার্লিন নগরীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবো। তারিখটা ৮ই মে, ২৫শে বৈশাখ। হোটেলের লাউঞ্জে বসে আছি ; তল্পিতল্পা অনেকক্ষণ গুটানো হয়ে গিয়েছে। মনটা এমনি আনমনা। রবীন্দ্র-উৎসব মনে পড়ছে। স্মরণকালের মধ্যে এই প্রথম ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়ি গেলাম না।

এমন সময় অকস্মাৎ আমাদের স্টিলকা এল। আজ আর বিমান-সেবিকার বেশ নয়। লাবণ্যময়ী আনতমুখী শ্বেতনয়না।

কই, তেমন কলকল ছলছল করতে করতে ত আমাদের সম্ভাষণ জানাল না? অথচ সহাসমুখ, বরং আরো তৃপ্তি-উজ্জ্বল, আরো আনন্দঘন। তবে কেমন সলাজ দৃষ্টি। আজ আর একা নয়। আরে, এ যে! হাঁ, কলকাতারই ছেলে, ভাল গান জানে। স্টিলকা পরিচয় করিয়ে দেয়, রূপেন। আর মুহূর্তও দেরী হয় না। সেই লাউঞ্জেই আমাদের রবীন্দ্র-আসর জমে ওঠে। রূপেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় ধীরে ধীরে, গলার স্বর নামিয়ে। আমরা কাড়াকাড়ি করে সে গানের কলি ইংরাজীতে অনুবাদ করি—

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্ল শ্যামল ধরা।

শ্বেতনয়না স্টিলকা আবার বুঝি সেরকম ঝমঝম করে উঠে। ঝমঝম করে ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন কি পার্থক্যটুকু ঘটে গিয়েছে। আমরা কাড়াকাড়ি করি, অনুযোগ করি, লিপলিং, তুমি তেমন উদার-বর্ষণ হচ্ছো না কেন? স্টিলকা হাসে, আজ সরব নয়, নীরব লজ্জারুণ হাসি, রূপেনের দিকে বারে বারে তাকায়। আর এই প্রথম দেখি, স্টিলকার আঙ্গুলে বিবাহ-প্রতিশ্রুতির আংটি। এবার আমাদের পালা। আমরা তুড়দাড়িয়ে আমাদের বাঁধা তল্পিতল্পা লক্ষ্য করে ছুটি—বাঁধন খুলে আর হাতড়ে যে যা পাই, তাই নিয়ে ছুটে আসি, আর হুড়মুড় করে স্টিলকার হাতে গুঁজে দিয়ে প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানাই। রবীন্দ্র-সন্ধ্যা পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। আমরা ক'জন বিদেশী একান্ত আপন জ্ঞানে আপনজনকে সোৎসাহ সংবর্ধনা জানাই। রূপেন হাসে। স্টিলকা, শ্বেতনয়না মেয়েও হাসে। উৎসাহী সহঃবন্ধু সিঁদুর-টিপ আর সিঁদুর-সিঁথির বর্ণনা করে।

মূর্তিমান ছন্দ-পতনের মত আমাদের গাইড হের ওরস্ বার্তা নিয়ে উপস্থিত হন, পাল তোল, যাত্রার সময় হলো।

এবার যেতে হবে। রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আসর ভেঙ্গে গেল। বিদায় নিলাম একে একে। তবে জার্মানীতে এই প্রথম প্রাণভরে আর প্রাণ খুলে একান্ত নিশ্চয়তায় স্টিলকাকে ভিডারজেন বল্লাম। দেখা হবে। স্টিলকা বাঙলা দেশে বধূ হয়ে আসবে। ভিডারজেন, ভিডারজেন। স্টিলকা ও রূপেনও হাত নাড়লো, ভিডারজেন। আবার দেখা হবে।

আবার দেখা হবে।

সংবাদ পেয়েছি, স্টিলকা শ্রীমতী সীমন্তিনী হয়ে আমাদের দেশে আস্‌ছে আর ক'মাসের মধ্যেই। ভাবছি, এই পরিবেশে সে সন্ধ্যার সেই সপ্রতিভ শ্বেতনয়না বিমান-সেবিকাকে কেমন দেখবো? সে দেখা-হওয়া আর এ দেখা-হওয়ায় কি আকাশ-যোজন ব্যবধান ঘটবে না? না, সীমন্তিনী শ্বেতনয়না সলাজ হাসি হেসে ধীরে ধীরে গাইবে—

এলেম নতুন দেশে—
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে।

কান্নার প্রাচীর

ফ্রাউকে কথা দিয়ে এসেছিলাম, 'কান্নার প্রাচীরের' কথা লিখবো। যে প্রাচীর কন্যার জীবনের সবচেয়ে বড় শুভদিনে, শুভলগ্নে বাপ-মায়ের আশীর্বাদ থেকে তাকে বঞ্চিত করলো, সেদিন প্রাচীর-সংলগ্ন, পশ্চিম বার্লিনের মাটিতে দাঁড়িয়ে আর সেই রোরুদ্যমানা সদ্যবিবাহিতা যুবতী কন্যাকে দেখে আমিই সে প্রাচীরের নাম দিয়েছিলাম 'কান্নার প্রাচীর'। ভাষা বুঝিনি। কিন্তু সে ছবি দেখতে দেখতে বারবার আমার মনে হয়েছিল, এ প্রাচীর—কান্নার প্রাচীর, এর অন্য নাম যাই হোক।

যুবতী কন্যা বলিষ্ঠ কাঁধে মাথা রেখে সেই পথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আকুল হয়ে কাঁদছিল। বলিষ্ঠ পুরুষও কেমন যেন বিহ্বল, হতচকিত, অসহায়। যেন অনেক সান্ত্বনা দিতে চায়, কিন্তু বুঝতে পারছে না, কী বলবে।

কেমন একটা বেদনায় আমার মনটাও আপ্লুত হয়ে পড়েছিল। সঙ্গী দোভাষীকে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম সেই দম্পতির কাছে। ব্যাকুল দুটি চোখ তুলে কন্যা আমার দিকে তাকিয়েছিল।

সে জলভরা চোখ আজও ভুলিনি। সে যেন উদ্বেগ-উদ্বেল বেদনা-সমুদ্র।

দোভাষীর মারফৎ সেদিন যা বলেছিলাম, হয় ত অন্য পরিবেশ হলে একথা বলতাম না, বলতে পারতাম না। স্বাভাবিক লজ্জাবোধ বাধা দিত, কেননা সদ্যবিবাহিত ঐ জার্মান দম্পতির জীবনে ঐ দিনটির আনন্দও যেমন তাদের একান্ত নিজস্ব, ব্যথা-

বেদনাও তাদের একান্ত ব্যক্তিগত। বিদেশী আমি, স্বতঃই আমার সংকোচ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু না, সেদিন সেই মুহূর্তে কোন সংকোচ হয় নি, ঐ জার্মান কন্যার ব্যথায় কেমন একাত্মতা অনুভব করেছিলাম।

ধীরে ধীরে গভীর আবেগভরে বলেছিলাম, ওগো কন্যে, আমি বিদেশী, তবু তোমার ব্যথা, তোমার বেদনা আমার অন্তর দিয়ে আমি অনুভব করছি।

সেই ডাগর দুটি চোখে মুহূর্তে আনন্দ-বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। আরো আবেগের সঙ্গে বলেছিলাম, তোমাদের এই কান্নার প্রাচীরের কথা লিখবো, লিখবো।

আজ দেশে ফেরার অনেক দিন পরে কান্নার প্রাচীরের কথা লিখতে গিয়ে বারবার সেই পৃথিবীটাই চোখের ওপর ভেসে উঠছে।

কন্যার বৃদ্ধ পিতামাতা পশ্চিম বার্লিন ও পূর্ব বার্লিনের মাঝখানের ঐ প্রাচীরের ওপারে পূর্ব বার্লিনে ক'খানা বাড়ীর পরেই রয়েছেন। কন্যা তার বিবাহে পিতামাতার আশীর্বাদ যাচ্ঞা করতে চায়। না, সে উপায়ও নেই।

আমাদের পরিচালক-দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এরকম দিনেও মেয়ে ওদিকে বাপ-মার কাছে একবার যেতে পারে না?

উত্তর এসেছিল: না, (পশ্চিম) বার্লিনবাসী কারোর পূর্ব বার্লিনে যাওয়ার অনুমতি মেলে না। পূর্ব বার্লিন কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয় না। তবে পূর্ব বার্লিন থেকে কেউ এদিকে নিশ্চয়ই আসতে পারেন, পশ্চিম বার্লিনে তাতে কোন বাধা নেই, কিন্তু পূর্ব বার্লিন তা চায় না, বাধা দেবে।

আজ সেই সব ছবি মনে ভীড় করে আসছে। তাই আজও বলি, বার্লিন নগরীকে পশ্চিম ও পূর্ব বার্লিনে বিভক্ত করে যে প্রাচীর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার অন্য যে পরিচয়ই থাকুক, ও হলো কান্নার প্রাচীর। এই প্রাচীরের পশ্চিম বার্লিনের দিকে প্রাচীর-সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত নির্জন পথে (পশ্চিম বার্লিনের অন্যান্য পথের তুলনায়) হাঁটতে হাঁটতে আমার সেদিন যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা অবিমিশ্র বেদনার অভিজ্ঞতা, ব্যথারই অভিজ্ঞতা। সেই ক'ঘণ্টার বিষণ্ণতায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়েছে, যে রাজনীতিতে, যে রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের আবেগ ও আকুতিকে, মানুষে মানুষে পারিবারিক প্রীতির সম্পর্ককে অবলীলাক্রমে বলি দেওয়া হচ্ছে, সে রাজনীতি কখনই সু-রাজনীতি নয়।

আমার জার্মানী সফরে আমি প্রথম থেকে রাজনীতি পরিহার করে এসেছি। কিন্তু এ ত রাজনীতি নয়, এ মানবিকতার হত্যা। দেশবিভাগের বেদনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। বাংলা বিভাগের বেদনাময় পরিণতি আমাদের মনের অত্যন্ত গভীর ক্ষতস্থান। বোধ হয় সেইজন্যই সেদিন বার্লিনের প্রাচীরের পশ্চিম বার্লিনের দিকে দাঁড়িয়ে সারা মনটা অতখানি বেদনাভিভূত হয়ে পড়েছিল।

আজও সে সব ছবি বিস্মৃত হইনি। তা বুঝি বিস্মৃত হওয়া যায়ও না। পশ্চিম বার্লিনের দিকে পথে মাঝে মাঝে কাঠের পাটাতন বা স্ট্যাণ্ড তৈরি করা হয়েছে। সেই সব পাটাতনে উঠে পশ্চিম বার্লিনের মানুষ ওধারের আত্মীয়স্বজনদের অভিবাদন জানাচ্ছে। জানাচ্ছে বলা ঠিক নয়, জানাবার চেষ্টা করছে। জার্মান মেয়েদের সঙ্গে ঐরকম পাটাতনে উঠে দেওয়ালের অপর ধারে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি, কোথায় বা কে? পূর্ব জার্মানীর সেনানী টহল

দিচ্ছে ; থমকে দাঁড়াচ্ছে, আবার হাঁটতে সুরু করছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ যে। ঐ দূরে—ঐ বাড়ীর ত্রিতলের বারন্দায় তুই বৃদ্ধবৃদ্ধা ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, আর ঐ যে রুমাল নাড়ছে। না, পূর্ব বার্লিনের দিকে প্রহরারত সেনানী বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছে। এই হলো আত্মীয় সন্দর্শন। এই হলো এপার-ওপার জানাজানি।

অনেকক্ষণ এক একটি পাটাতনের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই একই দৃশ্য দেখেছি। প্রৌঢ়া পাটাতন থেকে ধীর মন্থর পায়ে নেমে গিয়েছে। বিষণ্ণ। বিষাদময়।

তবুও কি এ প্রাচীর পূর্ব বার্লিনের মানুষের পশ্চিম বার্লিনের প্রতি আগ্রহবোধের প্রবণতা রুখতে পেরেছে? ওপারের মানুষ এপারের আত্মীয়স্বজনদের জন্য বোধ করবে, আকুল হবে, আগ্রহান্বিত হবে, এ ত স্বাভাবিকই। পূর্ব জার্মানীর উলব্রীস্‌ত্‌ সরকার পূর্ব বার্লিনবাসীর মনে প্রাচীর তুলতে যে পারেনি, তা পূর্ব বার্লিনে আমার নিজের ক'ঘণ্টার অভিজ্ঞতায়ই সেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম। তবে পূর্ব বার্লিনে সর্বদা একটা ভয়চকিত ভাব। মন খুলে, দরাজ গলায় নিশ্চয়ই কাউকে বলতে শুনিনি যে, ও প্রাচীর মিথ্যা, ও প্রাচীর ভুয়া, ও প্রাচীর আমরা মানি না। কিন্তু পূর্ব বার্লিনে সোভিয়েট ওয়ার মেমোরিয়ালের প্রাঙ্গণে অনেক প্রৌঢ় প্রৌঢ়াকেই দেখেছি, বিষণ্ণকাতর মুখ; নারকীয় যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের। হয় ত জোয়ান ছেলে মেয়ে যুদ্ধে বলি হয়েছে। স্বতঃই সন্ত্রস্ত তারা। অনেক জিজ্ঞাসার পরে এক প্রৌঢ় দম্পতি মাত্র বলেছিল, পশ্চিম বার্লিনে তাদের ছোট মেয়ে রয়েছে।

পূর্ব জার্মানীতে কম্যুনিষ্ট প্রচারণা ও প্রশাসনের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ বংশধররা বড় হয়ে উঠছে, তারা কি বোধ করবে জানি না,

তবে এটুকু নিঃসংশয়ে বলতে পারি পূর্ব বার্লিনবাসীর মনকে সেখানকার কম্যুনিষ্ট শাসন রুখতে পারেনি। মানুষ নিছক রুটি ও রুজি ছাড়াও যে বেশী কিছু চায়, নৈকট্য চায়, সম্প্রীতি চায়, রক্ত-সম্বন্ধের সান্নিধ্য চায়, সবচেয়ে বড় করে চায় স্বাধীনতা, নিজের ইচ্ছায় চলার, ভাবার, কিছু করার অধিকার, তারই প্রমাণ বার্লিনের এই প্রাচীর ভেদ করবার জন্য পূর্ব বার্লিনের মানুষের দিক থেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চেষ্টার অসংখ্য ঘটনা।

১৯৬১-র ১৩ই আগষ্ট পূর্ব বার্লিন কর্তৃপক্ষ এই প্রাচীর খাড়া করবার পর থেকে পূর্ব বার্লিন হতে পশ্চিম বার্লিনে চলে আসবার জন্য কি সব দুঃসাহসিক চেষ্টার ঘটনাই না ঘটে গিয়েছে। আমি যখন জার্মানীতে ছিলাম, এ রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করিনি বটে, তবে তার ক'দিন আগেই—বার্লিন-বেষ্টনীতে নয় অবশ্য—পূর্ব জার্মানী—পশ্চিম জার্মানীর কাঁটাতারের বেষ্টনী পার হতে গিয়ে পূর্ব জার্মানীর কিশোর ছেলেটি যেখানে পূর্ব জার্মানীর সৈন্যের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল, সে স্থানটি দেখে এসেছি।

তা'ছাড়া প্রাচীরের ধারে পশ্চিম বার্লিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি, প্রাচীরের লাগোয়া পূর্ব বার্লিনের দিকে বিরাট বিরাট অট্টালিকা হয় খাঁ খাঁ করছে, আর না হয়, পশ্চিম বার্লিনমুখী জানলাগুলি ইঁট-পাথর-সিমেন্ট দিয়ে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীরের ধারে পশ্চিম বার্লিনে পথে অনেকগুলি স্থানেই ক্রুশচিহ্ন আর ফুলের মালা দেখেছি। এগুলি অকারণ নয়। ওপারের ঐ বাড়ী থেকে প্রাচীরের ওপর দিয়ে এধারে লাফ দিতে গিয়ে এখানে প্রাণ হারিয়েছিল পূর্ব বার্লিনের কোন যুবক, কিংবা অসীম সাহসিক কোন বৃদ্ধ। এ রকম অসংখ্য ঘটনার স্মৃতির সাক্ষর পশ্চিম বার্লিনে

প্রাচীরের ধারে ধারে। এ ছবি স্বতঃই গভীর বেদনায় মনকে অভিভূত করে।

কিন্তু কেন এই স্থানত্যাগের চেষ্টা? ১৯৬০-এর বড়দিনের সময়ের একটি ঘটনা থেকেই এর উত্তর পাওয়া যায়। তখনো কিন্তু এ কান্নার প্রাচীর ওঠে নি। পূর্ব বার্লিনবাসীদের তখনো পশ্চিম বার্লিনে গিয়ে বড়দিনের সওদা করতে দেওয়া হতো। ঘটনাটি হলো এই: লিপজিগের এক আশী বছরের বৃদ্ধা পশ্চিম বার্লিনে তার পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে পূর্ব বার্লিনের পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাকে বাধা দেয়। পুলিশের শাসানি হলো: কি আস্পর্ধা! তুমি আমাদের কাছে দরখাস্ত দাখিল করার সাহস রাখ? মা হয়ে তোমার দেখা উচিত ছিল তোমার ছেলে যাতে ওদিকে কাজ না করে আমাদের সঙ্গে কাজ করে। বৃদ্ধা মিনতি জানিয়েছিল, 'আমি শুধু আমার ছেলেমেয়েকে আর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' কিন্তু না, প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি।

মানুষের এই স্বাভাবিক স্বাধীনতা হরণ মানুষ বরদাস্ত করতে চায় না। পূর্ব বার্লিন থেকে স্থানত্যাগের চেষ্টার যে সব ঘটনাই ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে অন্যায় বাধ্যবাধকতার প্রতি বিদ্রোহের প্রবণতা। তবুও ১৯৬১-র ১৩ই আগষ্ট পর্যন্ত, যতদিন পাকাপোক্ত করে এই প্রাচীর তোলা হয়নি, পূর্ব বার্লিনবাসী ও পূর্ব জার্মানীর অধিবাসীরা পশ্চিম বার্লিনে যেতে পারতো। পশ্চিম বার্লিনের দিক থেকে কোন বাধা তখনো ছিল না, এখনো নেই। পূর্ব বার্লিন থেকে ক্রমশঃ এ ব্যাপারে কিছু কড়াকড়ি করা সুরু হতে থাকলেও ঐ সময় পর্যন্ত মোটামুটি পশ্চিম বার্লিনে আসা চল্‌তো। আর তখনই যদি পশ্চিম বার্লিনের সমৃদ্ধি, তার আত্মসংগঠন, তার

ঔজ্জ্বল্য, হাঁ প্রাচুর্যও পূর্ব বার্লিনবাসীদের আকৃষ্ট করে থাকে, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফলে তখন থেকেই পূর্ব বার্লিন তথা পূর্ব জার্মানী ত্যাগ সুরু হয়। এই বাস্তুত্যাগ যদি স্বাভাবিক পথে পূর্ব জার্মানী সরকার বন্ধ করতে না পেরে থাকেন, তা তাঁদেরই অক্ষমতা। সেই অক্ষমতার আক্রোশই আজ 'কান্নার প্রাচীর' হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোড়ায়ই বলেছি, এ সফরে রাজনীতি সযত্নে পরিহার করে চলেছি। কাজেই দু বার্লিনের তুল্যমূল্য আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে পশ্চিম বার্লিন যত উজ্জ্বল, পূর্ব বার্লিন বুঝি ততই নিষ্প্রভ। পূর্ব জার্মানী সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্রই একটা কথা শুনেছি, ওখানে দেখো আলু কি মহার্ঘ্য, কি অপ্রচুর। জার্মানীতে আলু অন্যতম প্রধান খাদ্য—আমাদের ভাত ডালের মতই। ভাত ডালের পাল্লায়ও যদি কম্যুনিষ্ট সরকার পিছিয়ে পড়ে, নিছক আইনের বাধ্যবাধকতা কি করে পূর্ব জার্মানীর মানুষকে বাঁধবে, বিশেষ করে তাদের স্বাধীনতা দমন করে, রুদ্ধ করে?

কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। পশ্চিম বার্লিনের প্রত্যেক মানুষই সেদিনের স্বপ্ন দেখে। বিপুল প্রাচুর্যের মধ্যেও পশ্চিম বার্লিনবাসী পূর্ব বার্লিনের মানুষ, আত্মীয়স্বজনদের ভোলে না, ভুলতে পারে না। বিদেশী আমি, তবু জার্মান মনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই দিকটি আমি স্বতঃই অনুভব করেছি। একটা প্রবল আশা পশ্চিম বার্লিন, পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি; আশা হলো যে এই মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যবধান লোপ পাবেই।

এ আশা আমিও জানিয়ে এসেছি। কম্যুনিষ্ট শাসন যদি মানুষের মন জয় করতে পারতো, নিরপেক্ষ দেশের মানুষ আমি

সমদৃষ্টিতে দু বিভাগেরই সমৃদ্ধি কামনা করে আসতাম। কিন্তু ব্যবধান যেখানে আক্রোশ থেকে সৃষ্টি, যেখানে একদিকে সর্বত্র ভীতি, সন্ত্রাস, আর একদিকে অসহ্য মনোবেদনা, সেখানে এ কামনা না জানিয়ে কি করে পারি যে, এ ব্যবধান রদ হোক ; মানুষ মানুষের সঙ্গে মেলবার, মেশবার স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করুক।

পশ্চিম বার্লিনের দিকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই প্রাচীরের লাগোয়া পথে পথে হেঁটেছি। কাঠের পাটাতনে মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়েছি। ছোট ছোট শিশুর দল মা বাবা দিদি দাদাদের কোলে উঠে পাটাতন থেকে প্রাচীরের অপর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আঙুল উঁচিয়েছে। মা বাবা দাদা দিদিরা হয়ত তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, একদা বার্লিন অখণ্ড মহানগরী ছিল ; আর ওদিকে ছিল আমাদের ঘর, আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের শান্তি।

ভাষা কিছু মাত্র বোধ্য হয়নি। তবে কর্মচঞ্চল ও বিলাসপ্রিয় বার্লিনবাসীর সে এক শান্ত সমাহিত অনন্যসাধারণ রূপ। 'কান্নার প্রাচীর' বেষ্টনীর ধারে ধারে—হাঁ, এদিক ওদিক দুধারেই, একটা তীব্র ব্যাকুলতা অনুক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে।

বর্ষাবাদল দিনে হামবুর্গ

বার্লিন থেকে হামবুর্গ গিয়েছি। বার্লিন আর হামবুর্গ। তুই-ই জার্মানীর জীবনে একান্তভাবে সত্য। হামবুর্গ বন্দর পৃথিবী বিখ্যাত। হামবুর্গকে জার্মানীর জীবনের স্নায়ুকেন্দ্র বলা যায়। হিটলারের জার্মানীর যুদ্ধ জাহাজ বিসমার্ক এই হামবুর্গেই তৈরি হয়েছিল। বার্লিন আর হামবুর্গ। বার্লিন মহিমাময়ী। হামবুর্গ কর্মময়। কাজ এ জাতির রক্তে। বার্লিনেও প্রাণোচ্ছ্বাস কর্ম ছাড়া নয়। তবে বার্লিনের জাঁকজমক, বার্লিনের আলো হাওয়ায় জীবন উপভোগটাই বেশী করে চোখে পড়ে। অবশ্য তার মধ্য দিয়েই একটা জাত স্বপ্ন দেখে চলেছে, জার্মানীর একীকরণের স্বপ্ন। জার্মানী এক, বার্লিন এক। এ প্রত্যয় এদের জনে জনে, মনে মনে। কিন্তু বর্তমান বিভাগ রদ হবে কি করে? এর উত্তরে এরা স্পষ্ট নয়। কিন্তু এদের আশাও হতাশ মানুষের প্রার্থনা নয়। এরা প্রার্থনা করে না, এরা দাবী করে। হামবুর্গের আকাশে বাতাসেও এই এক সঙ্কল্পধ্বনি।

হামবুর্গের জলহাওয়াটা এমনি মেদুর, জলো। আমাদের বর্ষাকালের বাঙলা দেশের মত। এই রোদ, এই বৃষ্টি। আবার এক একদিন সব সময়ই যেন মেঘলা। কখন যে বৃষ্টি ঝরবে, ঠিক নেই। হামবুর্গে শেষ দিন সারাদিনই অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরেছে। কিন্তু না, এ বৃষ্টি হামবুর্গের কর্মজীবনকে কিছুমাত্র ব্যাহত করেনি। এরা মনে করে না, এমনি বর্ষাবাদল দিনে 'তারে বলা যায়—'। এ কবিত্ব সপ্তাহের পাঁচটা কাজের দিনে এদের জন্য নয়।

জাহাজ তৈরি দেখতে গিয়েছি। ড্রাই ডক। কত বিভাগ। বৃষ্টি ঝরছে। কিছু কাজ ফাঁকায়-ও হচ্ছে। কিন্তু কাজে বিরাম নেই। অথচ জানি, এই কাজের ঘণ্টা শেষে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজবে, এদের জীবনের ডালি তখন কেবল আনন্দ-কলরব-ভরা দেখবো।

পশ্চিম জার্মানীতে সফরে অনেক দেখেছি, যা অভিভূত করে, যা চমক লাগায়, যা মুগ্ধ করে। বিজ্ঞানের যৌবন জার্মানীতে। তা দেখবো, সে আর বিচিত্র কি? সেজন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছি।

কিন্তু জাতটা কিভাবে যে যুদ্ধক্ষত মুছে ঋজু, সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়িয়েছে, তাই দেখবার। এদের মনে মনে প্রচুর অহঙ্কার যে এই ক' বছরের মধ্যেই এরা আমেরিকাকে অর্থ ধার দেবার, সাহায্য করবার সংস্থান, ক্ষমতা অর্জন করেছে। বার্লিন নিয়ে যখন সারা বিশ্বের শিরঃপীড়া তখনো এরা বলে চলে, অপেক্ষা করে চলেছি, দু' বার্লিন এক হবেই। এ বিশ্বাস এরা কোথায় পায়? পায় আত্মশক্তিতে। এই হামবুর্গেই, যুদ্ধে কি বিরাট ক্ষয় ক্ষতিই না হয়ে গিয়েছিল। সিটি হলে গিয়েছিলাম। হামবুর্গ সরকারের পক্ষ থেকে আলোকচিত্র দেখান হচ্ছিল। হামবুর্গ শহরটাই পশ্চিম জার্মানীর ফেডারেল সরকারের একটা স্টেটের মর্যাদা ভোগ করে। আলোকচিত্রগুলি যুদ্ধের অব্যবহিত পরের, আর বর্তমানের। আজ ক্ষত কোথাও নেই। এরা ঘা খেয়েছে প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের মনোবল শিথিল হয়নি।

এ লক্ষণের অন্য কোন অর্থ হতে পারে কিনা, তা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। তবে এটুকু ঠিক, বার্লিন সম্পর্কে এরা স্থিতাবস্থা নীরবে মেনে চলেছে এই আশাতেই যে সর্বোচ্চ কূটনৈতিক আলাপ-

আলোচনায় বার্লিন বিভাগ রদ হবে। বার্লিনের অধিকার বোধ এদের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

আরো ব্যাখ্যা করে বলি। এদের জাতীয়তাবোধ প্রচণ্ড এদের তরুণ সমাজ, যুব সমাজের উপর আমেরিকার প্রভাব পড়েছে বৈকি। এদের নৈশজীবন, এদের ভোগস্পৃহা প্রভাবিত হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা রক্ষণশীল। রক্ষণশীল এই অর্থে যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি এদের প্রচুর আকর্ষণ। বার্লিনের (পশ্চিম) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত ও কার্যতও সত্য। পশ্চিমী ত্রিশক্তির তত্ত্বাবধান অধিকার নামে মাত্র এবং সামরিকগতভাবে। তাও হয়ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়তো যদি না এদের প্রত্যাশা থাকতো যে উচ্চশক্তি পর্যায়ের আলোচনায় বার্লিন এক হবে। একথা আগেই বলেছি। বার্লিন এবং জার্মানী এক। এই এদের মনে মনে—সঙ্কল্প, বিশ্বাস। না, প্রার্থনা নয়।

হামবুর্গের জলো হাওয়ায় বসে বসে ভেবেছি। জার্মানী আজও বিশ্বের ভবিষ্যতের কেন্দ্রবিন্দু, মানদণ্ড। একদিন শক্তির দম্ভে, অহমিকায় জার্মানী পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বিশ্ববিপর্যয় নয় ত কি? সারা বিশ্বে জীবনের মূল্যবোধই পাল্টে গিয়েছিল। আজ, সেই দম্ভ, সেই অহমিকা অনুপস্থিত, কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিমান, আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসাবে জার্মানী আজও নিজের সমস্যা নিয়ে বিশ্বের দরবারে চ্যালেঞ্জ সহ উপস্থিত। বার্লিন এই চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের তাবৎ বৃহৎ শক্তি এ চ্যালেঞ্জের কি উত্তর দেয়, তার ওপরই বিশ্বের শান্তি, স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

কিন্তু এসব রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির কথা।

রাজনীতির বাইরেও হামবুর্গের একটা জীবন রয়েছে। বন্দর-শহর হামবুর্গ। কাজেই বিশ্বের তাবৎ দেশের মানুষের যাতায়াত এ বন্দর-শহরে। তাই বন্দর-রূপসীর তেমনি রূপসজ্জা, প্রসাধন-চর্চা। হামবুর্গের নৈশজীবনের খ্যাতি সুবিদিত। মেঘ মেঘ আকাশ আর বাদল হামবুর্গের নিত্যসঙ্গী। এমনি বাদল দিনে হোটেলের বারে যে নৃত্যগীতের জমজমাট আসর, তাতে নানান্ জাতির মানুষের সমাবেশ; বাদ্যের তালে তালে নৃত্যচ্ছন্দ, আলোর দ্যুতি আর পানীয় পরিবেশন—বর্ণাঢ্য বিলাস-জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

হামবুর্গ বন্দর-শহর হলেও ঠিক সমুদ্র তীরের শহর নয়। এল্‌ব নদী ও আলস্‌টারের সঙ্গম স্থলে এ শহর। এখান থেকে সমুদ্রে পৌঁছোতে চার পাঁচ ঘণ্টা পাড়ি দিতে হয়—তবেই নর্থ সী। এল্‌ব নদীতে ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ (টানেল) পথের অভিজ্ঞতা অভিনব বৈকি। তবে আলস্‌টারের জল ঘুরিয়ে যে কৃত্রিম আলস্‌টার হ্রদ তৈরি করা হয়েছে, সে হ্রদে নৌকাভ্রমণ, সে এক রোমাঞ্চময় আনন্দ অভিজ্ঞতা।

হামবুর্গ কাজ-আনন্দ-উপভোগের এক অপূর্ব সম্মিলনভূমি। আবার হামবুর্গের সাংস্কৃতিক জীবন কম প্রাচীন নয়। কিন্তু সে বিবরণ ভিন্ন বিবরণ।

হামবুর্গের জাহাজ কারখানায় ড্রাই ডকের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে যেমন বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়েছি, তেমনি গভীর রাতে হোটেলের কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে ঝরঝর বৃষ্টি ঝরার শব্দ শুনতে শুনতে বাংলা দেশের জন্য মন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে—তখনও হোটেল-ভবনের নিম্নতলে বারে বাদ্য আর নৃত্যচ্ছন্দ সুরের রেশ তুলে চলেছে।

জার্মানীর গ্রামে

এ যেন এক একটি সিলোটি ছবি। কোন্ শিল্পী নিপুণ হাতে তুলি দিয়ে একটির পর একটি ছবি এঁকে চলেছেন। রঙের পোঁচ পড়ছে। ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি।

পশ্চিম জার্মানীর লোয়ার স্যাক্সনীতে হ্যানওভার অঞ্চলের গাঁয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। শনিবার বিকেল। সেলে থেকে হ্যানওভার চলেছি, হ্যানওভার পেরিয়েও আরও দূর। সবুজ, সবুজ, সবুজ। যেদিকে তাকাই কেবল সবুজের সমারোহ। আমার মনে মনে একটা অহঙ্কার ছিল। আমার দেশ, আমার গাঁয়ের মত সবুজ সমারোহ বুঝি আর কোথাও সম্ভব নয়। সে অহঙ্কার আমার ভেঙে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেই এক ছবি, সেই অসীম শ্যামলিমা। মোটর যানের গতি বাড়ছে ৬০, ৮০, ১০০ কিলো-মিটারে। সবুজ, সবুজ—ক্ষেত, মাঠ, খামার সব মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথাও বা চাষী-চাষিনী জমিতে নিড়েন দিচ্ছে। কোথাও বা ঘোড়ায় লাঙ্গল টানছে। আবার কোথাও সাদার ছোপ ছোপ পাঁশুটে বা খয়েরী রঙের গরু চরছে। চেরী গাছের ফুলের বাহার অপরূপ, স্থানে স্থানে টিউলিপ ফুটেছে। মাঝে মাঝে টালির ঘর, এক ধরনের। সব ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে। সূর্য হেলে পড়েছে। কিন্তু অস্ত যেতে অনেক দেরী। তবে রোদের তেমন তেজ নেই। অনুজ্জ্বল রোদ পড়ে সবুজ সমুদ্র অপরূপ দেখাচ্ছে।

শহর নয়, নগরী নয়। একান্তই গাঁ, পল্লী। এই গাঁ, গাঁয়ের

মানুষের প্রীতি ভালবাসা—সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

জার্মানীর গাঁ দেখতে দেখতে চলেছি। বড় বড় শহর, আর বড় বড় হোটেলে থেকেছি। উপকরণ সরঞ্জাম প্রচুর। বহু কিছুরই ব্যবহার জানি না; ব্যবহার করিও নি। সে সব থেকে ছিটকে এসে এই সবুজ সমারোহের মধ্যে বড় ভাল লাগছিল। বারবার বাংলা দেশের শরৎকালের শ্যামলরূপ মনে হচ্ছিল। এমনি, এমনি শোভা—কত যে মধুময়।

এই গাঁ, জার্মানীর এই পল্লী, পল্লীর এই সমৃদ্ধি, এ যেন জার্মানীর হৃৎপিণ্ড। প্রাণের কী বিপুল সমারোহ এই গাঁয়ে।

অনেকক্ষণ অবিরাম চলে এসে থেমেছি পথের ধারে। গাঁয়ের ঘরকন্না দেখ্‌বো। দেখতে হবে এদের।

দুটি যুবতী মেয়ে, একটি শিশু বাঁকা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সব দেশের সব শিশুই বুঝি এক। অপরিচয়ের বাধা নেই। ভাষা কোন প্রশ্নই নয়। সবাই আপনজন। শিশুটি কচি হাতের হাত-বাঁটুলি আমার হাতে তুলে দিয়েছে অর্থাৎ তুমি নাও। যুবতী দুজন হাসছে। বলেছি, চা খাওয়াবে? হেসে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। ভাষা কুলোয়নি। ওরাও তেমনি। ভাষা অজানা। কেবল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে।

আরো এগিয়ে গিয়েছি। বৃদ্ধ ও হয়ত তার ছেলে কিংবা ভাই ঘর তুলছে। গিয়ে দাঁড়িয়েছি ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া, নেহরু, নেহরু বলে। বুড়ো বুঝেছে, এক গাল হেসে স্বাগত জানিয়েছে। ঘরে নিয়ে গিয়েছে। এই সবে ঘরের চাল উঠেছে, একটা ঘরের দেওয়ালে রং হয়েছে। বুড়ো হাতের ইশারা করে বুঝিয়েছে, সব নিজের হাতে

তৈরি করছে। বুড়ি এসেছে। বুড়িও এক গাল হেসে ফেলেছে। বুড়োর ঘরে টেলিভিশন, রেডিওয় গান হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে করে জেনেছি, বুড়ো একটি ফার্মে কাজ করে, গোরুর দুধ দোয়। এক একটা গোরু আধ মণেরও বেশি দুধ দেয়। বুড়োর খুব আপসোস, এখন ঘরে কিচ্ছু হচ্ছে না, চা-কফি খাওয়াতে পারল না। বুড়ো খুব খুশি। নিজের ঘর হচ্ছে, নিজেদের হাতে সব করছে। আলমারি, টেলিভিশন সব ঠিক ঠিক জায়গায় বসবে। ঘরে রং হবেঁ। রান্নাঘর হবে।

একটি—একটি নয়, দুটি কিশোরী মেয়ে দরজায় উঁকি মারছে। এগিয়ে গিয়েছি। এটুকু বুঝেছে কালকুট্টার লোক আমরা। হাতে হাতে ওদের ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট। তা-ই দু চারবার ওদের সঙ্গে খেলা হল। হাস্যোজ্জ্বল কিশোরী মেয়ে। আঙুল গুণে গুণে বুঝিয়েছে, স্কুলে যায়, ক্লাশ সিক্সএ পড়ে।

বিসেনডফ গাঁ। এ গায়ে ক'টি মুহূর্তই বা ছিলাম। তবু এরই মধ্যে একটা ভালোবাসার হাওয়া এসে লেগেছিল। তখনো সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী। তখনো মাঠে গোরু চরছে। গাঁ থেকে নিজেদের ছিনিয়ে নিয়ে মোটরযানে এসে বসেছি। হের ভিলস মোটর ছেড়ে দিয়েছেন। বিসেনডফ মিলিয়ে গিয়েছে। একের পর এক অনেক গাঁ-ই ছিটকে ছিটকে চলে গিয়েছে।

সব যেন ছবি। একটার পর একটা ছবি উল্‌টে চলেছি। শিল্পী এঁকেছেন তুলির টানে টানে। আমি মুগ্ধ দর্শক ছবির আলবাম দেখছি, ঘাঁটছি, পাতা ওল্টাচ্ছি।

জার্মানীর গাঁ। এই হলো পল্লী। বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ। প্রত্যেকের জন্য কাজ। দূরে কাছে ছোট ছোট শহর। অনেক

ধরেই মোটর যান। এই গাঁ দেখছিলাম, দেখছিলাম সবুজ—সবুজ—সবুজ। সবুজের সমারোহ।

বাংলা দেশের শরৎকালের কথা বড় বেশী করে মনে পড়েছে। অথচ জানি, এই মে মাসে বাংলা দেশে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ। তাই নয় কি?

অন্তর্বর্তীকালীন রাজধানী 'বন'-এ

বিদায় জার্মানী। জার্মান ভাষায় খুব সম্ভব 'বিদায়' বলে শব্দই নেই। অন্ততঃ কেউ তা বলে না। এরা সবাই বলে ভিডারজেন, আবার দেখা হবে। অনেকটা আমাদের প্রথার মত। বিদায় নেবার সময় বলতে হয় 'আসি', 'যাই' নয়। জার্মানীকে বলি, 'ভিঁডারজেন ঃ আবার দেখা হবে।'

জার্মানীর সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা আর হবে কিনা বলতে পারি না, তবে মানস দেখা নিশ্চয়ই হবে। এ এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে। দিন ১৯২০ ক্যালেণ্ডারের পাতায় নিতান্তই স্বল্প ক'টি দিন। কিন্তু আমাদের মত, বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষের জীবনে এই ক'টি দিনই এত দেখা, এত চেনার মধ্যে কাটিয়ে যাওয়া অমূল্য বৈকি।

'বন'-এ বসে বিগত ক'দিনের পাতা উল্টেছি, বিস্ময় আনন্দ সুখ-স্মৃতি স্মরণ করেছি। 'বন' পশ্চিম জার্মানীর আপাততঃ রাজধানী—কার্যতঃ প্রশাসনিক দফতর। আপাততঃ বলেছি এজন্যই যে বার্লিনের রাজধানীর মর্যাদা এরা সকলেই স্বীকার করে, তবে বিভক্ত বার্লিন নয়, এরা এক বার্লিন চায়। তাই বলছিলাম অস্থায়ী রাজধানী 'বন'। 'বন' আমাদের পশ্চিম জার্মানীতে শেষ পাল্লা। 'বন' যেহেতু রাজধানী ও প্রশাসনিক সদর দফতর, অতএব স্বভাবতঃই 'বন'-এ দেখার চেয়ে আলোচনার ভাগটা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ একরকম ভালই। বিদায় নেবার আগে সালতামামি করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যই কি এই সব আলোচনায় সঠিক সালতামামি করা হয়েছিল

সেদিন ? তাই কি হয় ? ক'দিনের দেখা, চেনা যা অভিভূত করেছে, মুগ্ধ করেছে, যা সমস্যার গভীরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তা কি জার্মানদের বলার বিষয় ? তা তোলা ছিল আমাদের দেশের মানুষের জন্য। আজ যখন দেশের মাটিতে বসে মূল্যায়ন করছি, তখনই এ কথা বলার। বলার বৈকি, এ জাতটার যা বৈশিষ্ট্য, এ জাতটার সাফল্য ও সমৃদ্ধির মূলে যে অপরিমেয় প্রাণশক্তি তার কথা, সঙ্গে সঙ্গে এও বলার আমাদের দেশের বহু তরুণ যুবকের মনোবল ভঙ্গের কথা। সবই বলার। তবে সব সময়ই শ্রদ্ধা করবো, এ জাতটার মনোবলের, এ জাতটার জাতীয়তাবোধের।

নিছক ভ্রমণ-সুখের জন্য যেমন অনেক সুযোগ পেয়েছি, তেমনি তারই মাঝে মাঝে এ জাতটাকে চিনতে চেষ্টা করেছি। ভ্রমণ-সুখের কথা রসিয়ে তারিয়ে বলতে হয় ; তা বলার মতই। অনেক রসালাপ, পরিহাস, জার্মান ভাষা সম্বন্ধে আমাদের বাচালতা, আমাদের প্রবাস জীবনকে সহনীয় করে তুলেছে, অন্যথায় এক একদিনের সন্ধ্যে, রাত্রি কি দুঃসহ দুঃস্বপ্ন নিয়েই না আমাদের আচ্ছন্ন করতো। কিন্তু তা করতে পারেনি। ভুল উচ্চারণে আউস গাং, আউস ফাট, বাঙালীর পানীয় জলের জন্য 'ভাসা ভাসা' বলে হাহাকার আমাদের অবসর সময়কে লঘু স্বচ্ছন্দ করে রেখেছে। এ সব গল্প অনেক তারিয়ে রসিয়ে বলার মত। গল্পই বটে।

সকালে বেরুতে হবে। কারোর ঘুম ভাঙ্গে কি ভাঙ্গে না, যাঁর ভেঙেছে, ফোন তুলে অন্য সহকর্মীকে ডেকেছেন। কিন্তু, না, বুঝি ভুল হয়ে গিয়েছে, খাস জার্মান ভাষায় সাড়া এসেছে 'মর্গেন' অর্থাৎ সুপ্রভাত। যিনি ফোন করেছিলেন ভয়ে ভয়ে কোন রকমে ইংরাজীতে 'সরি' বলে ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। পরে এই নিয়ে হাসাহাসি

করেছি। 'মর্গেন' বলেছেন আমাদেরই মধ্যে একজন। আচমকা ঘুম ভাঙ্গায় ফোন পেয়ে এ কদিনের অভ্যাস বশে ঘুম-গলায় বলে উঠেছেন 'মর্গেন'। ঠিক যে ইচ্ছে করে বলেছেন তা নয়, অভ্যাসে বলেছেন। আর, এই সব টুকিটাকি ভুল প্রমাদ আমাদের অনেক অনেক হাসির খোরাক জুগিয়েছে। এ সব তেমন তেমন শিল্পীর হাতে পড়লে অনেক রসালো হয়ে পরিবেশিত হতো। মুজতবা আলি বার্লিনের রেস্তোরাঁ হিন্দুস্থান হৌসকেই ত অমর করে রেখেছেন। বার্লিনে গিয়ে আমাদের একজন সেই রেস্তোরাঁ খুঁজতে গিয়েছিলেন। মুজতবা আলির বর্ণনা যাচাই করার জন্য কতটা ইচ্ছে ছিল জানি না, তবে ভারতীয় খানার জন্য তাঁর মনটা, প্রাণটা, মায় পেটটাও যে আকুলি বিকুলি করছিল, একথা তিনি পরে স্বীকার করেছেন। (দুর্ভাগ্য সে রেস্তোরাঁ বোমায় গত যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে।)

তা আকুলি-বিকুলি করবেই বা না কেন। প্রথম শ্রেণীর সব হোটেলে থাকা একান্তই রাজকীয় ব্যাপার। এ বিচারে আতিথেয়তার তুলনা হয় না। কিন্তু নিত্যই খাবার টেবিলে যাবার সময় এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ক'দিন ত সবাই মিলে পশ্চিম জার্মানীর সব মুরগীকুল শেষ করে ফেলা গেল। এরপর যদি জার্মানীতে মুরগীর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হবে ক'টি বাঙালী কুলতিলক, সঙ্গে পুরীর জগন্নাথদেবের প্রসাদপুষ্ট উৎকলতনয়। কিন্তু তারও শেষ আছে। অবশেষে আবিষ্কার করা গেল, সোল মাছ। আমি পারতপক্ষে দেশে সোল মাছ খাই না। তবু ভাবলাম, যাক দেশের মাছের স্বাদ পাওয়া যাবে ত। কাজেই খুব স্ফূর্তির সঙ্গে অর্ডার দেওয়া গেল। সোল মাছ,

তবে এ সোল সে সোল নয়। ইনি ইউরোপীয় সোল। অনেক বুঝিয়ে একটু বেশী ভাজিয়ে পুড়িয়ে যা নেওয়া গেল, তা ভক্ষ্য বলে গ্রাহ্য হলো প্রথম প্রথম বেশ ক'দিন। আনন্দও হলো, যাক্, খাওয়ার একটা বিকল্প খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু স্থান থেকে স্থানান্তরে তিনিও দুষ্প্রাপ্য হলেন। তখন অগতির গতি মুরগী এলেন আবার। তাও ভক্ষিত হচ্ছিলেন ভালই। রোজই বলি, টাট্‌কা, টাট্‌কা ত? হের ওয়েবার ঘাড় নাড়েন, হ্যাঁ কি না বলা শক্ত। তবু মনে মনে সান্ত্বনা পাই, যাক্, টাট্‌কা মুরগী ত! কিন্তু কে জানতো তাও মরীচিকা। আহা! আর দুটো দিন যদি এ স্বপ্ন না ভাঙতো। জার্মান প্রবাসী এক ভারতীয় বন্ধু অশেষ উপকার (উপকার না ছাই) করলেন বুঝিয়ে দিয়ে, এই যে মুরগী, ইনি মাত্র দুই তিন বৎসর পূর্বেই নিহত হননি, এঁর রক্ত পর্যন্ত চিকিৎসালয়ে জমা পড়ে গিয়েছে, ইনি এতদিন শীতলকুঞ্জে বাস করছিলেন, হঠাৎ ভারতীয় আমন্ত্রণ পেয়ে টাট্‌কা ফ্রায়েড চিকেনরূপে প্লেটে আবির্ভূত হলেন।

বন্ধুকে অভিশম্পাত দিলাম, আপনার আমাদের মোহান্ধকার ঘুচিয়ে লাভ কি হলো?

বন্ধু হেসে আবৃত্তি করলেন, Light more light.

এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতায় জেরবার হওয়ার বহু ঘটনাই ত বলার মত।

তাঁবু গোটাবার প্রাক্কালে 'বন'-এ একদিকে কেবল আলোচনার পর আলোচনা করে চলেছি, বার্লিন সমস্যা, নাটো শক্তি, রাশিয়া, পূর্ব বার্লিন, ভারত, গোয়া, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো, রৌরকেল্লা—কি না কি উঠেছে, পড়েছে। ঠাসবুনোন আলোচনা

স্তরের মধ্যে অনেক ছবিই সেদিন সরে গিয়েছে। তবে জানতাম রসাস্বাদ যখন অকৃত্রিম, তখন তেমন জল হাওয়ায় তা আবার সজীব হয়ে উঠবে। কিন্তু 'বন'কে বলেছি, তোমরা যা করেছো তোমাদের দেশে তা বিস্ময়কর, তা বৃহৎ সাফল্য, তবে ভারতকে তোমরা যথার্থ পটক্ষেপে বোঝবার চেষ্টা করো, জানবার চেষ্টা করো। তা করলে গোয়া-প্রশ্নে তোমাদের ভুল ধারণা কিছু থাকবে না, থাকতো না।

আমরা যখন পশ্চিম জার্মানী গিয়েছি, তখন গোয়া-প্রশ্নের সুমীমাংসা ঘটে গিয়েছে। গোয়াবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। ভারতের আপামর জনসাধারণ এজন্য আনন্দ বোধ করেছে; এজন্য স্বস্তি বোধ করেছে যে, ভারতের বুক থেকে একটি ক্ষত নিরাময় হয়েছে। পর্তুগীজ অপশাসনের জগদ্দল পাথর অপসারিত হয়েছে। এজন্য ভারতে সন্তোষ, স্বস্তি ও আনন্দ সর্বজনীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানীতে গিয়েছি।

এটুকু প্রত্যাশা সর্বদাই ছিল, জার্মানরা গোয়া-প্রশ্নে ভারতবাসীর আবেগ ও আকূতি অনুভব করবেন। গোয়ায় পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা বাদই দিলাম, যদিও মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঐ একটি কারণেই গোয়ায় বৈদেশিক অপশাসনের অবসান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল—কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় জার্মান জাতির পক্ষে জাতীয়তাবোধের দিক থেকে, জাতীয় আবেগ ও আকূতির দিক থেকেও গোয়া-প্রশ্নে ভারতকে বোঝা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, ভারতকে বোঝবার আদৌ চেষ্টা করা হয়নি, যদিও সত্য যে পশ্চিম জার্মান সরকার সরকারীভাবে কোন রকম সমালোচনা করা থেকে সব সময়ই বিরত থেকেছেন। কিন্তু এ ত নেতিবাচক নীতি। গোয়া নিয়ে সারা পশ্চিম জার্মান ব্যেপে ভারতের প্রতি দোষারোপ করা হচ্ছে, কটাক্ষ করা হচ্ছে, কিন্তু

জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে যেন কিছু বলার নেই। এই কি যথেষ্ট ছিল ?

জার্মানীতে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, গোয়া সম্বন্ধে জার্মানরা ভারতকে কী ভুল যে বুঝেছিল, তা কল্পনা করতে পারবেন না। জার্মান সংবাদপত্রগুলিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর এজন্য কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে; কার্টুন প্রকাশ করা হয়েছে এবং বলতে কি, বেশ তিক্ততারই সৃষ্টি হ.য়ছিল।

কিন্তু কেন এমন হলো ? কেন জার্মানরা গোয়া-প্রশ্নে ভারতকে বুঝতে চাইলো না বা বুঝতে ভুল করলো ? এ প্রশ্নটা সব সময়ই আমাদের মনে দানা বেঁধে থেকেছে এবং জার্মানীর যেখানেই গিয়েছি, প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছি। এই কথাই কেবল মনে হয়েছে, পশ্চিম জার্মানীর বার্লিন নিয়ে যে বেদনাবোধ, তা বুঝতে আমরা ত ভুল করি নি ; স্থানের দূরত্ব, পরিবেশের পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের তাঁদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে কোন অসুবিধা হয় নি। জার্মানরাই বা কেন সেটুকু পারলো না ?

এ সম্বন্ধে 'বন'-এ ফেডারেল সরকারের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিভাগের ডঃ বোর্ণিম্যানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। ডাঃ বোর্ণিম্যান, পশ্চিম জার্মানীতে এক শ্রেণীর লোক কেন গোয়ার ব্যাপারে ভারত সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছিলেন। সে কারণগুলিকে এইভাবে নথিভুক্ত করা যায়—

প্রথম হলো, জার্মানীতে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যাপক নয়, বরং বলা যায় অপ্রচুর। সেখানকার স্কুলে ভারত সম্বন্ধে কিছু পড়ানো হয় না বললেই চলে। শিক্ষার্থীরা রোমান সম্রাটদের বংশ-পরিচয়, কীর্তি-কাহিনী পড়ে, কিন্তু ভারতের কিছুই জানে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বে শান্তির দূতরূপে ভারত প্রধানমন্ত্রীর অতুলনীয় মর্যাদা। এই পটক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সম্বন্ধে জার্মানদের একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে। যা অবিমিশ্র শান্তি-প্রয়াস নয়, সে রকম কিছুর সঙ্গে শ্রীনেহেরুকে মিলিয়ে নিতে পারেনি তারা।

তৃতীয় কারণ হলো, পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে পর্তুগালের সম্পর্ক ভাল। তা ছাড়া, পর্তুগাল জার্মানের অনেক নিকটের। যদিও জার্মানিরা ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থক নয়, তবু পর্তুগাল প্রতিবেশী হিসাবে জার্মানীর নিকটতর।

ডঃ বোর্ণিম্যান এই কারণ কটি নির্দেশ করে বললেন, এ-জন্যই জার্মান জনসাধারণ কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তারা মনে করে, গোয়ায় সৈন্যপ্রেরণ আদৌ প্রয়োজন ছিল না। গোয়া ত স্বতঃই ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত হতো। গোয়ার ব্যাপারে ভারতের ব্যবস্থাবলম্বন আকস্মিক বলেই কিছুটা ক্রোধ সৃষ্টি করেছিল।

ডঃ বোর্ণিম্যানকে আমাদের যা বলার ছিল, অবশ্যই তা বলেছি। গোয়ার ব্যাপারে ভারতবর্ষ কত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছে, বারংবার কী কামনাই না জানিয়েছে যে, ফরাসীদের মত পর্তুগীজদেরও শুভবুদ্ধির উদয় হোক, কিন্তু সে কামনা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক পর্তুগীজদের অত্যাচার দম্ভ ক্রমশঃই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয় ধীবরকে হত্যা ইত্যাদি বহু কাণ্ডের পরই না ভারতীয় জোয়ান পাঠান হয়েছিল গোয়ায়। গোয়া আক্রমণ করা হয় নি। এ কোন যুদ্ধ ঘোষণা নয়। গোয়াবাসীর মুক্তি-সংগ্রামই পর্তুগীজ শাসনকে বিপর্যয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল। ভারত সরকার এই পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে গোয়াকে, গোয়ার মাটির মানুষদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন।

এসব কথা অনেক বলেছি জার্মানীতে। কোথাও দেখেছি, জার্মানরা আমাদের বুঝতে চেষ্টা করছে, কোথাও বা লক্ষ করেছি, তারা বলেছে তবুও শ্রীনেহরু সৈন্য দিয়ে আক্রমণ করলেন! ভারত সম্বন্ধে এই দ্বিধা রয়েই গিয়েছে। ভারত যে নিছক সাধুসন্তদের দেশ নয়, ভারত যে স্বাধিকার রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প, এটুকু বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। ফলে স্থানে স্থানে সুফল ফলেছে।

সর্বত্রই ভারতকে যথার্থ পটক্ষেপে বোঝবার চেষ্টা করতে বলেছি আমরা। এই হলো আমাদের মূল কথা। 'বন' থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে জার্মান প্রথারই অনুসরণে বলে এসেছি, ভিডার-জেন, আবার দেখা হবে।

পশ্চিম জার্মানীতে ছিন্নমূল

পশ্চিম জার্মানীতে উদ্বাস্তু দায় নয়, সম্পদ। প্রথমাবধিই তাই।

মিউনিক থেকে ২২ মাইল দূরে উদ্বাস্তু-উপনিবেশ দেখতে গিয়েছি। কলোনীর মেয়র মিঃ লেত্তারারের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। কলোনী পরিচালকদের আরও ক'জন ছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, অবশ্যই পশ্চিম জার্মান সরকারের পক্ষে এ একটা খুব বড় সমস্যা ছিল। প্রথম প্রথম খুব অসুবিধাও হয়েছে। কিন্তু এ সত্য বুঝতে বিলম্ব হয়নি, এই উদ্বাস্তুরা দেশের সম্পদ। এদের উদ্যোগে, কর্ম-ক্ষমতায় নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি হতে লাগলো। এইভাবে শিল্প পত্তনের ফলে পশ্চিম জার্মানীর অর্থনীতি ব্যাহত না হয়ে সমৃদ্ধই হতে আরম্ভ করলো। আর তার ফলে এই হঠাৎ আসা মানুষদের সম্বন্ধে বিরূপতা ত নয়ই, স্বাগত মনোভাব জাগতে লাগলো।

পশ্চিম জার্মানীতে নিছক পৃথক করে উদ্বাস্তু-সমস্যাটা বোঝার কোন উপায় নেই। যদিও উদ্বাস্তু আছে, সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ আছে (অন্ততঃ তখন ছিলো), তবু উদ্বাস্তুরা এখানে পৃথক সত্তা নয়, জার্মান সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানীতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা জার্মান সমাজেরই সমস্যা ; তাদের সুখ-আনন্দ জার্মান সমাজের সুখ-আনন্দ ; নিশ্চয়ই এ সুলক্ষণ। এ সমস্যাটা বুঝতে হলে জার্মান জাতের মূল প্রাণধর্মই অনুসরণ করতে হয়।

পশ্চিম বাংলা থেকে গিয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই জার্মানীর উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এ সমস্যার প্রচণ্ডতা

আমরা নিত্য অনুভব করি। ছিন্নমূল নরনারীর ব্যথা-বেদনা আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। বস্তুতঃ এ সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের নিকট এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। কাজেই উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম আমরা। অবশ্য পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম বাঙলার পটক্ষেপ যে এক নয়, সংস্থান সঙ্গতির ক্ষেত্রেও যে বিরাট ব্যবধান, সে সম্বন্ধে সব সময়ই সচেতন ছিলাম। ফলে তুলনা করবার ইচ্ছা কোন সময়ই হয় নি। তবে বাস্তুচ্যুত হওয়ার, ভিটেমাটি ছেড়ে আশার যে বেদনা, সেই বেদনাবোধ উভয় ক্ষেত্রেই কি এক নয়? সেজন্যই মিউনিকের নিকট উদ্বাস্তু-কলোনীতে খেলনার কারখানার বিভাগে-বিভাগে উদ্বাস্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের কর্মরত অবস্থায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। তাদের বয়সের ভারে কুঞ্চিত মুখের রেখার ভাষা পড়তে চেষ্টা করেছি। বলতে দ্বিধা নেই, সে মুখে বেদনার চিহ্ন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ভাবটাও ফুটে উঠতে দেখেছি যে, এই বয়সেও ভিন্ন পরিবেশে আমরা কারোর দায় নয়, বরং সম্পদ। এই যে স্বশ্রমে জীবিকা-সংস্থান এর আনন্দই আলাদা।

আমার মনে হয়েছে, পশ্চিম জার্মানীতে শরণার্থীরা সমাজে নিজেদের উপযোগিতা প্রমাণ করতে পেরেছেন এবং এতেই উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন ব্যবস্থার সাফল্য সূচিত হয়। যে খেলনা-কারখানাটি দেখতে গিয়েছিলাম, তা খেলনার বটে, কিন্তু আদৌ তাচ্ছিল্যের নয়। কারখানা-পরিচালকদের প্রতিনিধিস্থানীয় একজন প্রৌঢ় উদ্বাস্তু আমাদের ক'টি খেলনা উপহার দিতে দিতে বললেন, আশা করবো, ভবিষ্যতে ভারতেও আমরা খেলনা রপ্তানি করতে পারবো। আমরা হেসে বলেছি, সে ভবিষ্যৎ আজও ভবিষ্যতের গর্ভে; কেননা আমরা খেলনা আমদানি করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে

চাই না এখন ; খেলনার চেয়ে অনেক জরুরী ও বড় কাজ আমাদের রয়েছে।

এই সব কথা হয়েছে আর আমরা সবাই মিলে প্রাণ খুলে হেসেছি। খেলনা-কারখানার প্রদর্শনীকক্ষটি মুহূর্তের জন্য হাসিতে আনন্দে প্রীতিতে ঝমঝম করে উঠেছে। তা এই খেলনা-কারখানার কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করতে পারেন নিশ্চয়ই। এ কারখানায় বৎসরে ৩০ লক্ষ মার্কের (জার্মান মুদ্রা) মত খেলনা-সামগ্রী তৈরি হতে পারে। আমেরিকায় প্রচুর খেলনা রপ্তানি হচ্ছে এ কারখানা থেকে সরাসরি। ভারতের বাজার কামনা করবে, এ আর বিচিত্র কী ?

জার্মানীতে থাকতে উদ্বাস্তু-সমস্যাটি নিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ-স্থানীয়দের সঙ্গে কয়েকবারই আলোচনা হয়েছে। লক্ষ করেছি, তাঁরাও পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ রাখেন, অবশ্যই সবটা নয়। তা হয়তো রাখা সম্ভবও নয়, কিংবা সংখ্যা-পরিসংখ্যান স্মরণ রাখলেও আমাদের সমস্যাটি সঠিকভাবে বোঝা তাঁদের পক্ষে কঠিনই। তবু বলবো উদ্বাস্তু-প্রপীড়িত এক বন্ধু দেশের সহানুভূতি আমাদের মন স্পর্শ করেছে।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, পশ্চিম জার্মানীর উদ্বাস্তু-সমস্যা এবং সে সমস্যার প্রতিকারে তাঁদের সর্বাত্মক সংগ্রামের কথা। সব আগে অবশ্য সমস্যাটির একটা হিসাব নিকাশ করা উচিত। পশ্চিম জার্মানীতে উদ্বাস্তু ও বিতাড়িত দু'শ্রেণীর লোক এসেছে। অবশ্য উদ্বাস্তুরাও এক অর্থে বিতাড়িত নয় কি ? পূর্ব জার্মানীতে জীবনযাত্রা হয় সুখকর হয়নি কিংবা সেখানকার 'বাধ্যতামূলক শাসন-ব্যবস্থা' অসহ্য হয়ে পড়েছিল, সেজন্যই তারা পশ্চিম জার্মানীতে চলে এসেছে। আর এক দল এসেছে—জার্মানই তারা—কাছাকাছি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হয়ে। এ সম্বন্ধে পশ্চিম

জার্মানীর অর্থাৎ ফেডারেল রিপাবলিকের সরকারী পুস্তক-পুস্তিকায় বলা হয়েছে, গত ১১ বছরে, ফেডারেল রিপাবলিকের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭০ লক্ষেরও বেশী। এর কারণ, মৃত্যু-হার অপেক্ষা জন্ম-হারের আধিক্য নয়, পরন্তু শরণার্থী ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত ব্যক্তিদের দলে দলে আগমন।

এ সম্বন্ধে মোটামুটি যে হিসেব করা হয়েছে, তা এই রকম—৯৭ লক্ষ বিতাড়িত এসেছে; উদ্বাস্তু এসেছে ৩৯ লক্ষ। এ ছাড়াও জার্মান বংশোদ্ভূত নয়, এ রকম ২ লক্ষ জন এসেছে। পশ্চিম জার্মানীর যা লোকসংখ্যা, তার শতকরা ২৫ জন হচ্ছে উদ্বাস্তু।

জার্মানীতে বেকার-সমস্যা নেই-ই। বরং বলা যায়, ৫ লক্ষের মত চাকুরী ফাঁকা রয়েছে। অর্থাৎ আমরা যখন গিয়েছিলাম তখনকার হিসেবে, আরো এত জন লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। একটা বিবরণীতে বলা হয়েছে : পূর্ব বা পশ্চিম, যেখানকারই জার্মান হোক না কেন, সব জার্মানেরই পুরাপুরি কর্মসংস্থান হয়েছে, পরন্তু ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশ থেকেও আগত ৬ লক্ষ লোককে পশ্চিম জার্মানীর সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম জার্মানীতে উদ্বাস্তু-সমাগম যখন ঘটছিল, তখন স্বভাবতঃই অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিম জার্মান সরকার তা শুধু আয়ত্ত করেই ফেলেনি, সেই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানও সম্ভব করে তুলেছে, যদিও আংশিক সমস্যা পরেও আরো কিছু দিন থেকেছে, হয়ত আজও কিছু আছে, তবে সে সমস্যা মুখ্যতঃ গৃহ বা আবাস সংস্থানের সমস্যা এবং তা পশ্চিম জার্মানের আদি অধিবাসীদেরও সমস্যা। ১৯৫০ সাল থেকে ৬৫ লক্ষ বাসস্থান নির্মিত হয়েছে। সরকারী মুখপাত্র বলছিলেন, তাহলেও এই গৃহসংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু আগেই

বলেছি, এই সমস্যাটি জার্মানীর সাধারণ সমস্যা এবং সেভাবেই এর সমাধান করবার জন্য জার্মানী তৎপর।

কিন্তু এ ত গেল ভিন্ন কথা। উদ্বাস্তু-সমস্যাটা এদের প্রথম ধাক্কায় প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিলেও জার্মানীর অর্থনীতিক জীবনকে পর্যুদস্ত করতে পারে নি এবং উদ্বাস্তুরাও ক্রমশঃ সুষ্ঠু পুনর্বাসনের সুযোগ পেয়েছে, সদ্ব্যবহারও করেছে। এই দ্রুত সাফল্যের হেতু কি, তা মোটামুটি একটা হিসেব করে দেখা যেতে পারে।

আমার প্রথমেই যা মনে হয়েছে, তা হলো জাতটা অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী এবং সেজন্যই সরকারের পক্ষেও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। দলে দলে বাস্তুচ্যুত হয়ে এসেছে, কিন্তু কি অন্তর্বর্তীকালীন শিবিরে, কি কলোনীতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলায় যাবতীয় দায়িত্ব পালন করাটা কিছুমাত্র বিস্ময়কর মনে হয় নি। যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নীত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছে, তখনো নীরবেই অপেক্ষা করেছে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, কাজ করার জন্য এদের আগ্রহ লক্ষ করবার মত। জার্মান জাতটাই কর্ম-পাগল। বসে সাহায্য নেওয়ার ইচ্ছে এদের কোন দিনই থাকে নি। ফলে ছোটখাট শিল্প গড়ে উঠেছে, সরকারও চেষ্টা করেছে উদ্বাস্তু জনসংখ্যার সদ্ব্যবহার করে নতুন নতুন শিল্প গড়তে। তবে একটা কথা নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতে হবে, পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিকের যথেষ্টই চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া জার্মানী যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত হয় তখনো তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত শিল্পোন্নত দেশ। কাজেই উদ্বাস্তুদের কর্ম-সংস্থানের মধ্য দিয়ে পুনর্বসতি সাধন খুব বেশী কঠিন হয় নি।

তৃতীয়তঃ, উদ্বাস্তু-সমস্যাটির যে দায়ভাগ, তা সারা জার্মান জাতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানীতে

উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধানের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, তার নাম 'ইকোয়ালিজেশন অব বার্ডেন ল'। এ আইনের মর্মার্থ হলো ভার সমভাবে ভাগ করে নেওয়া। পশ্চিম জার্মানীতে যখন ফেডারেল সরকার মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অর্থ সংস্থান ও সংগ্রহের প্রশ্ন উঠলো। সারা পশ্চিম জার্মানীতে একটা সমীক্ষা চালানো হলো। যে সব পরিবার বিগত যুদ্ধে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সেই সব পরিবারের উপর একটা বাধ্যতামূলক ট্যাক্স আরোপ করা হলো।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, এতে আপত্তি হয় নি ?

উত্তর ঃ আপত্তি যে একদম হয়নি, তা নয়, তবে এ ত দেশের আইন, কাজেই তা মান্য করতে হয়। এ বাবদ যে অর্থ হিসেব ধরা হয়, ঐ সময় পর্যন্ত তার অর্ধেক জমা পড়ে, তা হল ৮০।৯০ বিলিয়ন মার্কের মত। এটিকে সমাজগতভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর্যায়ে ধরা যায়।

তবে সব ওপরে হলো এ জাতের মনোবল। এ মনোবলই জার্মানীর উন্নতির মূলে ; এ মনোবলই উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধানের মূলে। কারিগরি দক্ষতা প্রচুর, আর্থিক সংস্থান অন্য দেশের সাহায্যে পুষ্ট হয়েছে, তা ছাড়াও সারা জার্মান জাতি উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সাধনের দায়িত্বটি জাতীয় দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছে, ফলে দায় ভাগ করে নিয়েছে এবং সর্বোপরি যারা এসেছে, তারা কাজ করতে জানে প্রচণ্ডভাবে। উদ্বাস্তু-সমস্যাটা জার্মানীতে আদৌ পৃথক সমস্যা বলে গণ্য হয় নি কোনদিন, জাতীয় সমস্যা বলে গণ্য হয়েছে বরাবর। এবং এ সমস্যার প্রতিকারের জন্য উদ্যোগও হয়েছে জাতিগতভাবে, আর সেজন্যই শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তুরা সমস্যা না থেকে জাতির পক্ষে আশীর্বাদই হয়েছে।

মনে মনে

জার্মান ভাষায় ভারত হলো ইণ্ডিয়েন (Indien)।

ভারতের মানুষ জার্মানীতে গিয়েছি। আমরা রয়ে সয়ে সব করি। আমাদের তাই অভ্যেস। কিন্তু এ হলো ঝটিকা গতি। বিমানে, ট্রেনে, মোটরে, যেখানে যা, তাতেই ছুটেছি। ছুটেছি নয়, ছুটিয়েছে। লম্বা লম্বা পাড়ি। সফরসূচীর বুননে এমনি হতে বাধ্য ছিল। তারই মধ্যে চোখ খুলে, মন খুলে রসদ আহরণ করে চলেছি।

সেই দেখার অনেকদিন পরে আজ, সে সব ছবি স্মরণ করতে গিয়ে দেখছি, একটা কেমন আবেশ লেগে রয়েছে সে সব স্মৃতিতে।

স্থান তারিখের খুঁটিনাটি সব ঠিকঠিক স্মরণ নেই। কিন্তু ছবিগুলি আজও উজ্জ্বল। টুকরো টুকরো ছবি। অনেক আলো আর ভাললাগার রং লেগেছিল সেদিন ; অনেক মানুষ চোখে ও মনে ধরেছিল সেই ঝটিকা পাড়িতে।

আজও বিশেষ সময়ে বিশেষ মুহূর্তে সেই সব ছবি, সেই মানুষগুলি ভীড় করে আসে। মানুষগুলি যেন বলতে চায়, ভারী লেখক ত হে, বলেছিলে আমাদের কথা লিখবে? কৈ লিখলে না ত?

'নতুন শহর নতুন মানুষ'-এর ইতি টানতে গিয়ে তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ঠিক ত, মানুষগুলির সমষ্টির ছবি এঁকেছি, মোটা

রেখায় লম্বা টান দিয়েছি, তাতে হয় ত জার্মান জাতটার বৈশিষ্ট্য ফুটেছে, কিছু ছবিও ধরা পড়েছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, মুহূর্তের পরিচয়ে যাঁদের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠেছিল, যাঁদের সাহচর্য প্রীতিপ্রদ মনে হয়েছিল, তাঁদের কথা লিখবো বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম, সে প্রতিশ্রুতি ত রক্ষা করি নি, অন্ততঃ পুরোপুরি। নাই বা স্থানকালের পরিচয় ঠিক রইলো, কিন্তু সেই মানুষগুলি ত হারিয়ে যায় নি, তারা আজও স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। সে সব মানুষের দুর্বল মুহূর্তের ছবি দেখেছি, পরিহাস করেছি, আবার কোথাও বা তেমন তেমন ক্ষেত্রে কেমন অভিভূতও হয়ে গিয়েছি।

মিউনিকের পর জেলব। জেলবের পথে ট্রেনে হোপে এসে নেমেছি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। এক একটা তুষার-ঝটকা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তার সঙ্গে বৃষ্টি। সহযোগী বন্ধু অনর্গল বলে চলেছেন, ভিডারজেন, ডাঙ্কেশ্যোন; আবার দেখা হবে, বহুৎ খুব ধন্যবাদ। কাউকে উদ্দেশ করে বলা নয়, এমনি বলা। অভ্যেস বশে বলা। কিংবা হাড়কাঁপুনি ঠাণ্ডায় কিছু গরম হবার জন্য বলা। ওভারকোট জড়িয়েও হু হু করে সব কাঁপছি।

মোটরের জন্য স্টেশন চত্বরে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এমন সময় একটা বড় ভ্যানমোটর এসে থামলো। এক মধ্যবয়স্ক জার্মান ভদ্রলোক ও একটি কিশোরী মেয়ে নামলো। আমাদের রকম-সকম দেখেই হোক বা আমাদের এক সহযোগীর মুদ্রাদোষের মতো কাল্ট কাল্ট (শীত শীত), ভিডারজেন, ডাঙ্কেশ্যোন সব একসঙ্গে উচ্চারণ করার জন্যই হোক, ভদ্রলোক মেয়েকে নিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে

এলেন। তারপর সে কি আলাপের ঘটা। জার্মান ভদ্রলোক ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলেন ত, আমরা আরো ভাঙ্গা জার্মান বলি। আমাদের দোভাষী-পরিচালক তখন এধার ওধার ফোন করতে ছুটছেন, তখনো জেলব যাবার যান এসে পৌঁছোয় নি। আমরা একেবারে লাগামছাড়া। একে প্রচণ্ড 'কাল্ট' (শীত), তারপর এই জার্মান গ্রামবাসীর আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে, বেশ মজাও লাগছে। কিন্তু তখনো আসল ব্যাপারটি প্রকাশ পায় নি। ভদ্রলোক কখনো ভারতে যান নি বটে, কিন্তু ভারত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল, তাছাড়াও দু চারজন ভারতীয়কেও এর আগে দেখেছেন। কিন্তু মেয়েটি ? এই প্রথম ভারতের মানুষ দেখছে। ভদ্রলোক হঠাৎ কন্যার হাতদুটো টেনে এনে সেই তুষার-বৃষ্টির মধ্যেই গ্লাভস খুলে দেখাতে লাগলেন, এই, এই দেখুন।

আমরা ক'জন শীতার্ত মানুষ কৌতূহলে ঝুঁকে পড়েছি। কি ? না, কিশোরী কন্যার হাতে কাঁচের চুড়ি ক'গাছি। সেই যে আমাদের দেশে মেলায় রথতলায় বেচে, আর মেয়েরা ভীড় করে চুড়ি পরে, সেই চুড়ি ; আর দু হাতে দুটো শাঁখার চুড়ি, সূক্ষ্ম কাজ করা।

জার্মান ভদ্রলোককে তখন দেখবার মত, ইণ্ডিয়েন, ইণ্ডিয়েন। তাঁর কোন আত্মীয় ভারতে গিয়েছিলেন, তিনি এই চুড়ি উপহার দিয়েছেন।

মেয়েটি বুঝি কিছু লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকের মহা-উৎসাহ। আমাদের সহযোগী বন্ধুদেরও অবস্থা তথৈবচ।

আমার খুব ভাল লাগছিলো। বাঙলা দেশের মেলার সেই শাঁখা ও চুড়ির দোকানের ছবি চোখের উপর ভাসছে তখন।

চুড়িওয়ালী কিশোরী কন্যা কিংবা নববধূর কচি হাত টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রং রং চুড়ি পরাচ্ছে, আর মুখে বলে চলেছে, যা মানাবে লক্ষ্মীঠাকরুণকে।

জার্মান মেয়ের সেই চুড়ি-শাঁখা পরা লজ্জানম্র চেহারা আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কোন মেলায় কিশোরী কন্যাকে চুড়ি পরতে দেখলেই হোপের সেই ছবিটি মনে পড়ে। আর মনটা কেমন আবেশ-বিহ্বল হয়ে যায়। সেই সুদূর জার্মান পল্লীতে সেদিন ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও মনটা কতই না ভাললাগায় ভরে গিয়েছিল, আর অকিঞ্চিৎকর চুড়িও স্বদেশের স্মৃতি বিমণ্ডিত হয়ে কী পরম রমণীয়ই না মনে হয়েছিল।

এই রকম কতই না ছবি জমা হয়ে রয়েছে স্মৃতির মণিকোঠায়।

জেলবকে ব্যাভেরিয়ার সাইবেরিয়া বলা হয়। জেলবেরই এক টুকরো স্মৃতি। পাতলা ছিপছিপে তরুণ। বেশ চৌকস। যে সুন্দর হোটেল বাড়ীতে আমাদের আস্তানা, সেখানকারই পরিবেশক। সকালে চা-এর সময়ে দেখেছি, দুপুরেও মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ে, সেদিন রাত্রেও দেখেছি। চাইতে হয় নি, নানান কিছু এনে হাজির করেছে। মৃদু হেসেছে। না, ঠিক বললাম না, মুখে সব সময়ই হাসি লেগে রয়েছে। বেশ ছেলে। দ্বিতীয় দিনও সকালে দুপুরে দেখেছি,—সন্ধে থেকেই বেপাত্তা। ফলে ডিনার টেবিলে অঢেল খাবার এল, মুরগীর রোষ্ট, আরো কত কি। কিন্তু সস-এর শিশিটা এল না, ক'টুকরো টমেটো কাটা এল না। নতুন পরিবেশককে

বার বার বলেও বোঝাতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম।

পরের দিন সকালে আবার দেখি সেই হাসিমুখ।

চড়াও হই, ব্যাপার কি?

তরুণটি হাসতে থাকে।

বলি, উঁহু, হাসি নয়। জানো কাল আমাদের কি হাল হয়েছে!

(অবশ্যই আমাদের দোভাষী-পরিচালকের সাহায্য নিয়েই কথা বলি।)

তরুণটি হেসে ফেলে, ফ্রেণ্ড—।

মজা পাই, অঃ, গার্ল-ফেণ্ড!

মৃদু মৃদু হাসে।

কৌতূহল প্রকাশ করি, বন্ধুকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে?

এবার ওর বলার পালা, অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম; এমিলিকে কাল ডিনার খাওয়াবো বলেছিলাম, তাই।

আমরা অনুযোগ করি, সে কি! তুমি এখানে নিয়ে এলে না কেন, আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতো এমিলি।

তরুণটির মুখ গম্ভীর হয়। আমরা একটু থতমত খেয়ে যাই।

ও বলে, এখানে আমি কাজ করি। আমি একবেলা ছুটি নিয়েছিলাম কাল। এখানে হলে আমাকে ডিউটি দিতে হতো। তাহলে আর এমিলির সঙ্গে আমার ডিনার খাওয়া কি করে হতো?

সত্যি, এ ব্যাপারটা ভেবে দেখি নি। লজ্জা পাই।

তরুণটি আবার হেসে ফেলে। সেই এক হাসি হাসি মুখ। ভরসা পাই।

এবার চেপে ধরি, তাহলে বলো এমিলি কত সুন্দর? কি করে ভাব হলো? ও কি করে? না, পড়ে?

তা তরুণটি সব কথাই বলে। আর এই প্রথম জানলাম, সে ইতালীয়। এমিলি জার্মান মেয়ে; স্থানীয় একটি কারখানায় টেলিফোন অপারেটর।

হোটেল-রেঁস্তোরায় বেশীর ভাগ পরিবেশকই (হের ওয়েঁবার) ইতালীয়। ইতালীয় যুবকদের জার্মান মেয়ে বন্ধু হতে বিলম্ব হয় না। তারই এমিলির সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার আগে অন্য বন্ধু ছিল। সে কতদিন আর এ শহরে এসেছে? এই বছর দেড় হবে। ইতালীয়রা এত আকর্ষণীয় হবার কারণ কি? কারণ কিন্তু অদ্ভুত। ইতালীয় ছেলেদের চুলের রং কালো, আর তাই-ই নাকি তাদের মহা আকর্ষণীয় করে।

সহযোগী বন্ধু পরিহাস করেন, তাহলে চান্স ত—

ইতালীয় তরুণটি হেসে ফেলে, এমিলিকে আপনাদের কথা বলেছি, ও আলাপ করতে চায়।

সেদিনই এমিলি এসেছিল। সাধারণ জার্মান মেয়ে। চুল কটা। (তাই বুঝি কালো চুলে মন মজে।) চিন্তাধারা, রুচি এমন কিছু উঁচু দরের নয়। গান, শিল্পকলা, এ সব ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ নেই; রাজনীতি সম্বন্ধেও কেমন নিরুৎসাহী। বরং বেশী আগ্রহ কক্‌টেলের গল্পে, পোশাক পরিচ্ছদের ডিজাইনের কথায়; ভারতের মেয়েদের প্রাক-বিবাহ জীবন সম্বন্ধেই নানান প্রশ্ন করতে লাগলো।

এমিলি তেমন কিছু চোখে পড়ার মত নয়, কিন্তু ইতালীয় তরুণটির সেই হাসি হাসি মুখ ও একটা সহজ আন্তরিকতা সহজেই মন জয় করে। জেলবে আমরা ক'জন রীতিমত তার 'গুণমুগ্ধ' হয়ে পড়েছিলাম।

আমাদের দোভাষী-পরিচালক হের ভিলস্-এর কথা কিছু বলি। খাঁটি জার্মান তরুণ। সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জীবন শেষ করেছেন। ক'মাস পরেই বিবাহ করছেন। ভাবী বধূর সঙ্গে পরিচয় সাড়ে তিন বছর। সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। চোখে মায়াঞ্জন, মনে উচ্চাশা, সুস্বাস্থ্য। আজকের যুগের জার্মানীর প্রতিভূ।

আমাদের ঝটিকা-সফরে হের ভিলস্ নিছক দোভাষী-পরিচালকের চেয়ে যেন বেশী কিছু ছিলেন। বন্ধু, সুহৃদ। ফলে অনেক সময়ই মন উজাড় করে দিয়েছেন। ভাবী বধূর ফটো দেখিয়েছেন, ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি এঁকেছেন কল্পনায়। সে কল্পনার, সে সাধের, সে স্বপ্নের ভাগ দিয়েছেন আমাদের।

আমরাও কখনো পরিহাসতরল হয়েছি। কোন পার্টি বা ভোজ-সভায় কিংবা কোন হোটেলে আপ্যায়নকারিণীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে তাঁর ভাবী বধূকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো বলে শাসিয়েছি। হাসিতে, ঠাট্টায়, স্বপ্নে আর গল্পের আসরে কেমন যেন গভীর সখ্য গড়ে উঠেছে। অনেকবার মনে মনে ভেবেছি, হের ভিলস্-এর ভাবী বধূকে যদি মুর্শিদাবাদের সিল্কের শাড়ী পাঠাই, কেমন হবে?

না, পাঠানো হয় নি। দেশে ফেরার পর অনেকগুলো দিন কেটে গিয়েছে। হয় ত এর মধ্যে ভিলস্ দম্পতীর ছোট্ট

৬

ফ্ল্যাটটি নব সাজে সেজেছে। হের ভিলস্ আজ হয় ত পুরোদস্তুর ব্যবহারজীবী। (তিনি আইনের পরীক্ষা দিয়েছিলেন।) কিংবা কে জানে ফরেন অফিসে বড়সড় চাকুরী নিয়েছেন কিনা।

তরুণ, উৎসাহী, কর্তব্যপরায়ণ, শিক্ষিত, মার্জিতরুচিসম্পন্ন, কিন্তু সচরাচর যে জার্মান যুবকদের দেখেছি, বুঝি তাদের সঙ্গে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

মনে আছে, আমাদের সফরের একেবারে গোড়ার দিকে, তখন সবে জার্মানীর জাঁকজমক দেখা সুরু, কথা হচ্ছিল অর্থ নিয়ে। হের ভিলস্-এর কথায় বিস্মিত হলাম। তিনি বলছিলেন, টাকা আমি পছন্দ করি না, তবে তা আমার প্রয়োজন। I do not like it, but I need it. অর্থাৎ টাকার অঙ্কে মানুষকে বিচার করা, জীবনের মান নির্ণয় করা ভিলসের পছন্দ নয়। তাঁর ভাবী গৃহিণীরও নাকি তাই অভিমত।

জার্মানীর শহরে বিলাসজীবন, জাঁকজমক, চাকচিক্য সম্বন্ধে যাঁরই অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই হের ভিলসের উক্তিতে বিস্মিত হবেন। বিস্মিত আমিও হয়েছিলাম।

তারপর জার্মানীতে পাড়ি শেষে যখন বিদায় নিয়েছি, তখন মনে হয়েছে, এই জার্মানীরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-দর্শন নিয়ে আলোচনা গবেষণা হয় আজও, সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে পঠনপাঠন চলে, পাশ্চাত্যে এই একটি মাত্র দেশ যেখানে প্রাচ্য দর্শন সাহিত্য নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। কাজেই এ দেশের শিক্ষিত কারো মনে যদি আত্ম-জিজ্ঞাসা জেগে থাকে, জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের হেরফের যদি ঘটে থাকে, অন্ততঃ তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবে হের ভিলসের দল সচরাচর চোখে পড়ে না, এ সত্য।

কয়েকজন বিদ্যার্থী গবেষককে দেখেছি। সাধারণ থেকে যেন

কিছু ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। চিন্তাপ্রবণ। ভিন্ন জগতের মানুষ যে দেখলেই বোঝা যায়। হের ভিলস্ অবশ্য ঠিক সে দলেরও নয়—তবে জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা অনেকটা প্রাচ্য ঘেঁষা। ভিলস্কে বলেছিলাম এ কথা। তার উত্তর হলো, তা জানি না, তবে দেখেছি ত টাকার অঙ্ক বেড়েই চলেছে, কিন্তু শান্তি বা স্বস্তি ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠছে।

জার্মানীর অতিব্যস্ত জীবনে অবশ্যই এ এক নতুন ভাবনা। এ ভাবনার বেশী পরিচয় পাই নি বটে, তবে পশ্চিম যে ততঃ কিম বলে ক্রমশঃ ভাবতে সুরু করেছে, তার আভাস জার্মানীতে পেয়েছি, ব্রিটেনেও পেয়েছি। বিলাস আয়োজনের প্রাচুর্য আজ আর মন ভরাতে পারছে না।

কিন্তু তা ভিন্ন কথা। হের ভিলসের কথাই বলি। জীবন উপভোগে তিনি যে পরাঙ্মুখ তা নয়, তবে ওরই মধ্যে কিছু নিভৃত স্বকীয়তার প্রত্যাশী। তবে একটি ক্ষেত্রে বুঝি সব জার্মান তরুণই এক, তা হলো জাতীয়তাবাদ ; স্বজাতি সম্বন্ধে অহঙ্কার বা আত্মগর্বের বুঝি তুলনা হয় না। ভিলস্ এদিকে দরাজ মন, কিন্তু রাজনীতির আলোচনায় চাপা, সংযত। কিন্তু যেমনি বলেছি, কম্যুনিষ্ট দেশ রাশিয়া বা তার অনুগামী পূর্ব জার্মানী খুব এগিয়ে গিয়েছে, ঠাণ্ডা মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, আর নানান্‌ভাবে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন। মজা দেখবার জন্যও অনেক সময়ে রাগিয়ে দিয়েছি। তারপর ঠাণ্ডা করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ; তাঁর ভাবী বধূর প্রসঙ্গ তুলতে হয়েছে, ফটো দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে হয়েছে। এইভাবে সামাল দিয়েছি।

জার্মানীর মাটি থেকে যেদিন বিদায় নিচ্ছি, হের

ভিলস্ সেদিনও বিমান বন্দরে ঠায় দাঁড়িয়ে। ভিলস্‌কে কলকাতায় মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিমানে উঠেছি।

আজ সে সব কথা মনে পড়ছে। বেশ সবল ঋজু তরুণ। মাঝে মাঝেই পকেট থেকে সন্ত ডাকে আসা ভাবী বধূর লিপি বার করে পাঠ করেন ; আমরা পরিহাস করি। ভিলস্ মজা পান।

আবার এই ভিলস্‌ই সময়ান্তরে দার্শনিক হয়ে পড়েন, I do not like it, but I need it.

কিন্তু এই প্রয়োজন কতখানি ? কত মার্ক ?

ম্যাডাম বাটারফ্লাই। প্রজাপতিই বটে। সুন্দরী তন্বী তরুণী কন্যার কাহিনী।

বার্লিনে সে এক অবিস্মরণীয় সন্ধে। খাঁটি জার্মান অপেরা দেখতে গিয়েছি। শঙ্কা ছিল, বুঝি ঠিক রসাস্বাদ করতে পারবো না। কিংবা হৈ হল্লা উত্তেজনাময় দৃশ্য, রীতিমত কার্নিভাল দেখেই ফিরে আসবো। অবশ্য কিছু যে আশা ছিল না, তাও নয়। জার্মান-জীবনের ঔজ্জ্বল্যের দিক, সমারোহের দিক, আনন্দ-কলরবের দিক এর মধ্যে অনেক দেখেছি, বার্লিনে যেদিন পা দিয়েছি, সেদিন থেকেই দেখেছি, তবে ভিন্ন ছবিও দেখেছি—সে ছবি কান্নার প্রাচীরে। (সে কথা লিখেছি।) ব্যথা, বেদনার সে আবেদন মন স্পর্শ করেছে। অভিভূত হয়েছি।

সেজন্যই আশায় আশায় বার্লিনের প্রখ্যাত অপেরা হাউসে হাজির হয়েছি। দর্শক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। সামনের সারির দিকে জার্মান দর্শকদের মধ্যে আমরা মাত্র কজন ভিনদেশী। তখনো

প্রদর্শনী আরম্ভ হতে কিছুক্ষণ বিলম্ব রয়েছে। আলাপমুখর প্রেক্ষাগৃহ। জার্মান ভাষা বুঝি না। বসে বসে দর্শকদের সেই হাসিভরা মুখই দেখছি। দেখছি জার্মান তরুণ তরুণী নিম্নকণ্ঠে আলাপমগ্ন। জার্মান কিশোরী কণ্ঠের কলকল ধ্বনি শুনছি।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকবো হয় ত। আমার সামনের সারিতে ঠিক আমার সরাসরি এক জার্মান মহিলা। তিনি মৃদু স্বরে ডাকছেন, আপনারা ভারতীয়, তাই না ?

ইংরেজীতে প্রশ্ন। সহযোগী বন্ধু কনুই দিয়ে আমাকে একটু ধাক্কা দেন। জার্মান মহিলার সহাস মুখ। তাড়াতাড়ি বলি, হ্যাঁ, ভারতীয়।

আলাপ করি। জার্মান মহিলা বেশ ইংরেজী বলেন। বার্লিনে একটি স্কুলে ইংরেজী পড়ান। শিক্ষিকা। ম্যাডাম বাটারফ্লাই অপেরাটির কাহিনী উনিই সংক্ষেপে বলে দেন। শুনে বিস্মিতই হই, শবরীর প্রতীক্ষা, জার্মান অভিনেত্রী এই প্রতীক্ষার বেদনা কিভাবে ফোটাবে ? এ বেদনার সর্বজনীন আবেদন কি তেমন পরিস্ফুট হবে ?

তখনো জার্মান অভিনয়শিল্প যে কতো উৎকর্ষ লাভ করেছে, তা জানতাম না ! 'ম্যাডাম বাটারফ্লাই' না দেখলে জার্মানীর একটি বিশেষ দিকই দেখা বাকী থেকে যেতো। কাহিনীর চুম্বক শুনে নিয়েছিলাম, তা না নিলেও কিছু অসুবিধা হতো না। কাহিনীটির এমনি এক সর্বজনীন আবেদন ছিল এবং অভিনয় গুণে তা এমনি জীবন্ত হয়ে ওঠে যে, স্বতঃই 'ম্যাডাম বাটারফ্লাইয়ে' বিদেশী স্বামীর প্রতীক্ষারত সেই জাপানী কন্যাটির প্রতি মন সমবেদনায় আপ্লুত হয়ে পড়ে। কথার ভাগ কম; নীরব অভিব্যক্তিতেই আবেগ প্রতিফলিত হচ্ছে। দয়িতের জন্য সেই আকূতি, দয়িতের সঙ্গে

মিলনাকাঙ্ক্ষায় সেই অভিসার আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে।

মার্কিন সামরিক অফিসার জাপানে এক কন্যার পাণিপ্রার্থী হল। কন্যার আত্মীয়স্বজনদের স্বীকৃতি ও সম্মতিতে তাঁদের মিলন ঘটে। তারপর মার্কিন অফিসার সেনা-বদলীতে দেশে ফিরে যান। আর তখন থেকেই সুরু হয় শবরীর প্রতীক্ষা। টুকরো টুকরো ছবি, কি ঐকান্তিকতায়ই না তা পরিবেশন করা হলো। মঞ্চে এক একটি দিন কত আশা নিয়েই না সুরু হয়। জাপানী গৃহসজ্জার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সেই গৃহও আবার নিত্য নবরূপ ধরে। প্রত্যাশায় প্রত্যাশায় দিন গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। রাতের অন্ধকার নামে। না, দয়িত আজও এল না। বেদনায় কন্যা ভেঙ্গে পড়ে। লণ্ঠনের শিখা নিঃশেষে পুড়ে নিবে যায়। অন্ধকারের নিভৃতে জাপানী বধূর কান্না গুমরে গুমরে ওঠে।

জাপানী প্রথায় মার্কিন সামরিক অফিসারের জাপানী কন্যার পাণিপ্রার্থনা দিয়ে যা সুরু, পরবর্তী পটক্ষেপে একটি করুণ কান্নায় তা বেদনাময়।

কী তীব্র আকূতিই না সেদিন সেই পরিবেশে, বিশ্বের অন্যতম ঐশ্বর্যময়ী মহানগরী বার্লিনের একটি প্রেক্ষাগৃহে, সম্পূর্ণ অপরিচিত ভিন্নভাষাভাষী দর্শককুলের মাঝখানে বসে অনুভব করেছিলাম! দৃশ্যপটের অন্দরমহলে করুণ সুর মূর্ছনা সে সন্ধেয় আমার সারা মন সেই পরিত্যক্তা, সেই অবহেলিতা বিদেশিনী কন্যার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় পূর্ণ করে দিয়েছিল। সে নাটকের সেই করুণ অভিব্যক্তি, সেই কন্যার সে ছবি, অপূর্ব প্রাণময়তার সঙ্গে রূপায়িত করেছিলেন জার্মান অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর নাম জানি

না, কিন্তু সেদিন সেই প্রেক্ষাগৃহে বসে সারা মন আপনা থেকেই অভিনেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হয়ে গিয়েছিল। জার্মান মেয়ের জাপানী কন্যার সেই চরিত্র চিত্রণ, নাটকের কাহিনীতে সুগভীর বেদনার সেই প্রকাশ, আজও স্মরণ করলে সারা মন ব্যেপে এক বিষণ্ণ সুর জাগে।

অভিনয় শেষে যখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছি, মন কেমন যেন তীব্র বেদনাসিক্ত। কথা বলি নি। শিক্ষিকা জার্মান মহিলা এগিয়ে এসেছেন। তাঁর চোখ মুখ জমাট কান্নায় থমথম করছে। নিজের মুখ দর্পণে দেখি নি। দেখলে একই ছবি যে দেখতাম সন্দেহ নেই। কথা বলতে ইচ্ছে হয় নি। হোটেলে ফিরে সে রাত্রে আর ডিনার টেবিলে বসি নি! এক দলা কান্নায় বুকটা তখনো টনটন করছে; অপেরায় দেখা সেই জাপানী কন্যার জলভরা চোখ কেবল চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠেছে— সেই মঞ্চের পশ্চাতে আবহসঙ্গীতের কান্নার সুর কেবল কানে বেজেছে।

তারপর অনেক দিন ভেবেছি, ভাষা জানি না, কথা বুঝি নি। সঙ্গীতের অর্থ বোধগম্য হয় নি, তবুও ত সেই মঞ্চের নায়িকার সঙ্গে তার ব্যথায়, তার বেদনায়, তার কান্নায় সমব্যথী হতে কোন বাধা ঘটে নি। কি করে হয়? হয়। হয়েছে। সেদিনের অভিজ্ঞতায়ই বুঝেছি, ব্যথায় বেদনায় মানুষে মানুষে মিলন। মননের পটক্ষেপেই মানুষে মানুষে অনেক মিল। সব দেশেই কান্নার অভিব্যক্তি এক। জার্মান অভিনেত্রীও সেদিন জাপানী কন্যার অভিনয় করে নি, জাপানী কন্যার কান্নায় কেঁদেছে সেদিন। আমিও প্রেক্ষাগৃহে বসে সেই কান্নায়ই অভিষিক্ত হয়েছি।

আজ অনেক দিন পরে সেই ছবি স্মরণ করতে গিয়ে মনটা ব্যথায় ভরে উঠছে। আমি আনন্দিত আমার জার্মান ভ্রমণে সেই একটি দিনও অন্ততঃ, সেই সীমায়িত কক্ষের মধ্যে সব জার্মান দর্শকের সঙ্গে বেদনার পটক্ষেপে একাত্ম হতে পেরেছিলাম। সেদিনই আমার প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয়েছে—অনুভবের জগতে সারা বিশ্ব এক, অখণ্ড। বিশ্বমন একাত্ম।

জার্মান সফরে এই-ই আমার সেরা পাওয়া।

জার্মানী পরিচয়

জার্মানী। আজও জার্মানী বলতে জার্মান রাইখ বোঝায়—১৯৩৭এ জার্মান রাইখের যে সীমা ছিল, সেই সীমা। তবে সাধারণ-ভাবে পশ্চিম জার্মানীকে জার্মান রাইখেরই উত্তরাধিকার বলে গণ্য করা হয়। সে দিক দিয়ে আজকের জার্মানী পশ্চিম জার্মানীই। ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী। আগে জার্মান রাইখ বলতে যতখানি বোঝাত, তার অর্ধেকের কিছু বেশী অঞ্চল আর পশ্চিম বার্লিন নিয়ে এই ফেডারেল রিপাবলিক।

১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর সামরিক পরাজয় ঘটলে দখলদারী পক্ষগুলি পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে জার্মান রাইখের যে সীমা ছিল, ১৯৪৫র জুন তা চারটি দখলদারী অঞ্চলে বিভক্ত হয়; তা'ছাড়া বার্লিন এলাকা থাকে চতুঃশক্তির দখলে। রাইখের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি বিচ্ছিন্ন করে সেগুলিকে হয় পোলিশ শাসনাধীনে, না হয় সোভিয়েট কর্তৃত্বে সমর্পিত হয়।

১৯৪৯ সালে পশ্চিম জার্মানীর 'ল্যাণ্ডার' বা প্রদেশগুলি নিয়ে ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী গঠিত হয়। এগুলি ছিল তিনটি পশ্চিমী শক্তির দখলে। সার অঞ্চল—যা যুদ্ধান্তে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, তা ১৯৫৯ সাল থেকে আবার পুরাপুরি ফেডারেল রিপাবলিকের একটি ল্যাণ্ডার বলে গণ্য হয়।

পশ্চিম বার্লিনকে বাদ দিয়ে ফেডারেল রিপাবলিকের আয়তন হ'ল ৯৫,৭৩৫ বর্গমাইল। উত্তর-দক্ষিণে ৫১৭ মাইল; পূর্ব-পশ্চিমে ২৮১ মাইল। (জার্মান রাইখের আয়তন ছিল ১৮৪,৪০০ বর্গমাইল।) পশ্চিম বার্লিনের আয়তন ১৮৬ বর্গমাইল।

১৯৫৫র প্রথমে পশ্চিম বার্লিন বাদ দিয়ে ফেডারেল রিপাবলিকের জনসংখ্যা ছিল ৫ কোটিরও বেশী, তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫ কোটি ৩৮ লক্ষে পৌঁছেছে (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬০র হিসাব)। পশ্চিম বার্লিনের লোকসংখ্যা ২২ লক্ষ।

এক নজরে জার্মান লোকসংখ্যা ঃ

ফেডারেল রিপাবলিক (বার্লিন বাদে) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬০	৫ কোটি ৩৮ লক্ষ
পশ্চিম বার্লিন ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬০	২২ লক্ষ
পূর্ব বার্লিন (বার্লিনের সোভিয়েট অঞ্চল) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬০	১১ লক্ষ
সোভিয়েট দখলী অঞ্চল (ডি ডি আর ঃ সাধারণভাবে পূর্ব জার্মানী) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬০	১ কোটি ৬২ লক্ষ
জার্মান রাইখের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা, যা এখন বিদেশী শাসনে (জনসংখ্যা সঠিক নির্ণীত হয় নি).	৭ লক্ষ
	মোট ৭ কোটি ৪০ লক্ষ

ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানীর জন্ম ঃ ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে রাইখ অঞ্চল পটাসডাম ঘোষণানুযায়ী বিভক্ত হয়।

১৯৪৯ সালে ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মান রাইখের পশ্চিমাংশ এবং রাইখের রাজধানী বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এই ফেডারেল রিপাবলিক গঠিত। ১৯৪৯র ২৪শে মে ফেডারেল রিপাবলিকের সংবিধান—মৌল নীতি (Basic Law)

বলবৎ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামরিক দখলদারী শাসনে তার সার্বভৌমত্বের উপর যে বিধিনিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছিল, ১৯৫৫র ৫ই মে তার অবশেষটুকুরও অবসান ঘটে। ফেডারেল রিপাবলিকের সরকার গণতান্ত্রিক, স্বাধীনভাবে নির্বাচিত এবং সার্বভৌম সরকার।

বার্লিনের (পশ্চিম) বিশেষ মর্যাদা : ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বার্লিন জার্মান্ রাইখের রাজধানী ছিল। যুদ্ধ যখন শেষ হলো, বার্লিন তখন রেড আর্মির দখলে। লণ্ডন প্রোটোকল অনুযায়ী বার্লিন সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা হলো এবং চারটি দখলদারী বাহিনীর যুক্ত নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হয়। ১৯৪৮এ সোভিয়েট কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বার্লিন নগরীর জার্মান প্রশাসন কার্যতঃ পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের দখল-অঞ্চলে (অর্থাৎ পশ্চিম বার্লিনে) সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৬১র ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে (ইষ্ট সেক্টর) ভিন্ন একরকম অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। তারপর কাঁটাতারের বেড়া ও প্রাচীর তুলে পূর্ব বার্লিনকে তাঁরা পশ্চিম বার্লিন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেন।

সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিম বার্লিন ফেডারেল রিপাবলিকেরই একটি ল্যাণ্ড বা প্রদেশ। তবে ১৯৪৫র চতুঃশক্তি চুক্তি অনুযায়ী 'বুন্দ' কর্তৃক এ নগরী শাসিত হতে পারে না।

'বুন্দেসটাগ' বা 'বুন্দেসরাট'-এ পশ্চিম বার্লিনের প্রতিনিধিদের ভূমিকা পরামর্শকারীর ভূমিকা। ১৯৫৭র ৬ই ফেব্রুয়ারী বুন্দেসটাগ জার্মানীর রাজধানী রূপে বার্লিনের মর্যাদাই সমর্থন করেন। তবে ফেডারেল সরকারের প্রশাসনিক সদর 'বনেই' থাকছে।

পশ্চিম বার্লিন সিটি গভর্ণমেণ্ট (সিনেট) দ্বারা শাসিত হচ্ছে। বার্গোমাষ্টার বা লর্ড মেয়র প্রধান ; তাছাড়া রয়েছেন দ্বিতীয় বার্গো-

মাষ্টার এবং ১১ জন সিনেটর। প্রতিনিধিসভা ১৪০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। ফেডারেল রিপাবলিকের যে কোন আইনই পশ্চিম বার্লিনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের পূর্বে এই প্রতিনিধিসভা দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। তবে বুন্দের অন্যান্য প্রদেশের প্রতি যে দায়িত্ব, বার্লিনের প্রতিও সেই দায়িত্ব বর্তমান।

নীতি ঃ সংবিধান—ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানীর সংবিধান ১৯৪৯র ২৩শে মে'র 'মৌল নীতি' (Basic Law) রূপে পরিচিত। এ এক সাময়িক ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য হ'ল যখন জার্মান রাইখের অন্যান্য অঞ্চল যুক্ত হবে, তখন সারা জার্মান জাতি সমগ্র জার্মানীর জন্য স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে নতুন সংবিধান রচনা করবে। আইনের শাসন—অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শই এই 'মৌল নীতি' সংবিধানের ভিত্তি।

সংবিধানের বিশেষত্ব হ'ল, রাইখের অন্যান্য অংশকে এক ও সম্মিলিত করার জন্য সকল জার্মানের যে মানসিক প্রবণতা, আকূতি বিদ্যমান, তা যেমন এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি সারা ইউরোপের প্রবণতাও মর্যাদা পেয়েছে। ফেডারেল রিপাবলিকের সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, ফেডারেল রিপাবলিক এই সঙ্কল্পও গ্রহণ করছে যে সম্মিলিত বিশ্বে সমান অংশীদার হিসাবে বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করবে।......উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে বুন্দ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে পারে। শান্তি সংরক্ষণের জন্য ফেডারেল রিপাবলিক কোন যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং ইউরোপে ও বিশ্বে স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ শাসন সুনিশ্চিত করবার জন্য স্বীয় সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতাই ফেডারেল জার্মানীর

পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা। সম্মিলিত ইউরোপ—কমন মার্কেট—ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, এসব ক্ষেত্রেও পশ্চিম জার্মানীর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান এবং সে দৃষ্টিভঙ্গী ইতোমধ্যেই মর্যাদা পেয়েছে।

ফেডারেল প্রেসিডেণ্ট ফেডারেল রিপাবলিকের প্রধান। বুন্দেসটাগ্ হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা। বুন্দেসরাট্‌কে বলা যায় 'দ্বিতীয় সভা'।

শিল্পোন্নতি ঃ যুদ্ধে ও যুদ্ধ পরবর্তীকালে শিল্পে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটে গিয়েছিল, ১৯৪৮ সাল থেকে সে অবস্থার দ্রুত পুনরুদ্ধার লক্ষ্য করে বৈদেশিক পর্যবেক্ষকগণ 'জার্মান অর্থনৈতিক যাত্নর' কথা বলে থাকেন। এ উন্নতির একটা আভাস এইভাবে দেওয়া যায়—১৯৫০এ শিল্পোন্নতিকে ১০০ ধরে হিসেব করলে ১৯৬০ সালে শিল্পোৎপাদন গড়ে ২৪৯এ পৌঁছোয়। অর্থাৎ দশ বৎসরে শিল্পোৎপাদন শতকরা ১৪৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

জার্মান অর্থনীতির মূল সূত্র হলো 'সোস্যাল মার্কেট ইকনমি।' এর অর্থ হলো এমন এক অর্থনৈতিক নীতি পদ্ধতি অনুসরণ, যার লক্ষ্য প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে স্বাধীন অবাধ উদ্যোগ ও সামাজিক উন্নতিকে যুক্ত করা, সম্মিলিত করা, অগ্রসর করা। বে-সরকারী উদ্যোগ ও মালিকানা উভয়ই সামাজিক বন্ধন ও দায়িত্বসাপেক্ষ। ক্ষতিপূরণ দিয়ে আইনের সাহায্যে ভূসম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদন যন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে যৌথ মালিকানায় হস্তান্তরিত করা যায়।

এক কথায় এ নীতি হ'ল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতির সাফল্য নির্দেশ করতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড হলো 'জাতীয় উৎপাদন'। পশ্চিম বার্লিনকে বাদ দিয়ে ফেডারেল এলাকায় মোট উৎপাদন ১৯৬১

সালের হিসেবে ৩১০,৪০০ মিলিয়ন ডয়েটস মার্কে পৌঁছোয় (২৭,৭০০ মিলিয়ন পাউণ্ড)। এ হলো পূর্ব বৎসরের সঙ্গে তুলনায় শতকরা ৯.৯ ভাগ এবং ১৯৫০এ যা ছিল তার চেয়ে তিন ভাগেরও (শতকরা ৩১৯) বেশী। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় অগ্রগতি যে অত্যন্ত লক্ষণীয়, সে বিষয়ে সন্দেহই নেই—

মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

[১৯৫৪র মূল্য হারে]

বার্ষিক বৃদ্ধির শতকরা হার

সময়	ফেডারেল রিপাবলিক	ফ্রান্স	ইতালী	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র
১৯৫১-৫৫	৯·০	৪·৪	৬·০	২·৫	৪·২
১৯৫৫--৬০	৬·২	৪·৩	৫·৯	২·৬	২·৩
১৯৬১	৫·[illegible]	৪·৪	৮·০	২·১	১·৯

সামাজিক কাঠামো: ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর সামাজিক কাঠামোর দ্রুত রূপান্তর ঘটতে থাকে। সরকারী চাকুরে, কেরানী—সবচেয়ে বড় হ'ল কর্মীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আগে যারা পরিবার-পরিজন নিয়ে কোন প্রধান বৃত্তি ব্যতীতই লাভজনকভাবে রুজি-রোজগার করতো, সে রকম লোকের অনুপাতিক সংখ্যা ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৩৯ সালে রাইখ অঞ্চলে শতকরা ৩৬·৯ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৩·৮এ দাঁড়ায়। ফেডারেল এলাকায় ১৯৫০এ এ সংখ্যা ছিল শতকরা ১৪·৫এ।

১৮৮২ সালে কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা

৪০। ১৯৩৯ সালের মধ্যে এ অনুপাত মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭·৭এ দাঁড়ায়; ফেডারেল এলাকায় ১৯৫৮য় তা পৌঁছোয় শতকরা ১১·৪এ। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৫০এ ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ, অর্থবিভাগ ও ইনসিওরেন্সে তাদের পরিবার পরিজন সহ নিযুক্ত লোকের অনুপাত শতকরা ৯·৬ থেকে বেড়ে ১৫·৬এ দাঁড়ায় এবং সরকারী চাকুরীয়ার সংখ্যা শতকরা ৮·৮ থেকে ১৩·৬এ গিয়ে পৌঁছোয়। শিল্প, হস্তশিল্প ও গৃহাদি নির্মাণে নিযুক্ত লোকের অনুপাত ১৮৮২ সালে ছিল শতকরা ৩৭, তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৯এর মধ্যে শতকরা ৪০এরও বেশী দাঁড়ায়।

১৮৭১ সালে রাইখ অঞ্চলে জনসংখ্যার শতকরা ৬৪ জন গ্রামাঞ্চলে বাস করতো; ১৯৬২ সালে ফেডারেল এলাকার লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৮ জন শহরাঞ্চলে বাস করে।

এই স্বাভাবিক সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে ত্রিশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ছুটি বিশ্বযুদ্ধ গিয়েছে। সম্পত্তির মালিকানায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৫০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল মাত্র ৯৭,০০০ মিলিয়ন ডয়েটস মার্ক (জার্মান মুদ্রা); ১৯৬১র মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১০,৪০০ মিলিয়ন ডয়েটস মার্কে পৌঁছোয়। এর অর্থ, বর্তমান (১৯৬৩) মূল্য হারের ভিত্তিতে মাথা পিছু ২০৭২ ডয়েটস মার্ক থেকে ৫৭৪৬এ বৃদ্ধি অথবা ১৯৫৪র ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে ২৪১১ ডয়েটস মার্ক থেকে ৪৬৭৫ ডয়েটস মার্কে পৌঁছোন।

জার্মানীর সমস্যা : আজ জার্মানীর প্রধান সমস্যা জার্মান ভাষাভাষীদের একীকরণ; এ সমস্যা মূলতঃ জাতীয় আবেগপ্রবণতা সম্ভূত। বার্লিনের প্রাচীর জার্মান মাত্রেরই ক্ষতস্থান।

এ ছাড়া আছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে বিতাড়িত জার্মান

ভাষাভাষীদের সমস্যা ; উদ্বাস্তু সমস্যা ; অ-জার্মান উদ্বাস্তু সমস্যা। অবশ্য উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে পশ্চিম জার্মানীর লক্ষণীয় সাফল্য ঘটেছে। তবে সমস্যা কিছু এখনো আছে।

ভারত-জার্মান সম্পর্ক : ভারত-জার্মান সম্পর্কের সূত্র সন্ধান করতে গেলে উভয় দেশের অতীত সাংস্কৃতিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হয়। বস্তুতঃ সংস্কৃত সাহিত্য চর্চায় ও গবেষণায়—প্রাচ্য সংস্কৃতির গবেষণাই বলা উচিত, জার্মান পণ্ডিত ও মনীষিদের কৃতিত্ব স্বতঃই ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করে। একমাত্র একনায়কতন্ত্রের কবলে যতদিন জার্মানী ছিল, ততদিন অবশ্য ভিন্ন কথা। নতুন জার্মানী আবার ভারতের সন্নিকটবর্তী হয়েছে। ভারতকে তার উন্নয়ন উদ্যোগে ফেডারেল জার্মানী অর্থ সাহায্য প্রদান করছে। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত বিনিময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু ভারতীয় শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে—বৃত্তি নিয়ে, বিনিময় পরিকল্পনায় বা স্ব-উদ্যোগেও জার্মানীতে গিয়ে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছেন। জার্মানীর কারিগরি নিপুণতা সুবিদিত। যে নৈপুণ্যের প্রতি স্বভাবতঃই ভারতীয় যুব সমাজ গভীর আকর্ষণ বোধ করে থাকে। এবং তা যুক্তিসহই। যত দিন যাচ্ছে, নানানভাবে ভারত-জার্মান সৌহার্দ্য সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।